আদর্শ

কিভাবে প্রচার করতে হবে

আবু সালীম মুহাম্মদ আবদুল হাই

আদর্শ কি ভাবে প্রচার করতে হবে

আবু সালীম মুহাম্মদ আবদুল হাই

অনুবাদ ঃ জুলফিকার আহমদ কিসমতী

আইসিএস প্রকাশনী

ঢাকা

অভিমত

ভালো কথা ভালো করে বলার মধ্যেই তার সার্থকতা। বিশেষ করে ইসলামের সত্য ও সুন্দর আদর্শ যারা প্রচার করেন এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব অনেক। শুধু ভালো করে বলাই নয়, শ্রোতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব।
মুসলমান মাত্রই খোদার দ্বীনের প্রচারক। আজকের এ ব্যাপক অবনতির যুগেও এমন অনেক মুসলমান ভাই আছেন, যারা ইসলামের দাওয়াত অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়াকে নিজেদের ওপর ফরয মনে করেন। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শ্রোতার মানসিক অবস্থা অনুযায়ী বক্তব্য পেশ না করায় অনেক সময় বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। লেখক ইসলামী আদর্শের বাণী বাহকদেরকে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন। 'আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে' বইটি যেমন একদিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারীকে বক্তব্য প্রকাশের টেকনিক শিক্ষা দেবে তেমনি অন্যদিকে তার চরিত্র গঠনেও বিশেষ সহায়ক হবে। বইটিতে চমৎকারভাবে শ্রোতৃ-সমাজের মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে বক্তব্য পেশ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার পদ্ধতি বাৎলানো হয়েছে। লেখকের প্রকাশভঙ্গী যেমন সহজ সরল; তেমনি হৃদয়গ্রাহীও। অন্য বইয়ের অনুসরণে লেখা হলেও বইটির ভাষা সহজবোধ্য এবং হৃদয়গ্রাহী।
বলতে গেলে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই এই প্রথম। এদিক দিয়ে প্রকাশক বাংলা ভাষাভাষীদের একটা বিরাট অভাব পূরণ করেছেন বলে মোবারকবাদের অধিকারী।

১লা এপ্রিল, ১৯৬৪

আবদুল মান্নান তালিব
মাসিক পৃথিবী
৭১, নিউ এলিফেন্ট রোড
ঢাকা-১২০৫

প্রথম কথা

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কথাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। কোনো ব্যক্তি তার নিজের মত ত্যাগ করে আপনার মত গ্রহণ করবে, এমনটা সহজে হয় না। অথচ অপরের কাছে আপনার কথা পৌছাতে হবে এবং সেও একে নেবে, একমাত্র এ পথেই ইসলামী বিপ্লব আসে। ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে মানুষকে সর্বাগ্রে ইসলামের দাওয়াত বুঝতে হবে, তার যাবতীয় বিধানকে নিজের জীবনে কার্যকরী করতে হবে এবং নিজের যাবতীয় চিন্তা ও মতবাদ পরিত্যাগ করে ইসলাম প্রদত্ত মতবাদ গ্রহণ করতে হবে, এরই প্রয়োজন সর্বাধিত। এ উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার চেষ্টা করে যাওয়ার নাম 'তাবলীগ' বা ইসলামী আদর্শের প্রচার।

এ আদর্শ প্রচারের কাজ সহজ নয়। এজন্যে প্রয়োজন যথেষ্ট জ্ঞান ও প্রজ্ঞার। এ উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার পথে সহায়ক এমন কতিপয় পরামর্শ এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে এথেকে উপকৃত হবার জন্যে শর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

(১) যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের প্রচারকল্পে এ সকল পরামর্শ থেকে উপকৃত হতে ইচ্ছুক, তাকেই সর্বাগ্রে ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা রাখতে হবে এবং নিজের মধ্যে সে সমস্ত আকীদা-বিশ্বাসকে যথাযথভাবে কার্যকরী করতে হবে- যা তাওহীদ, আখিরাত এবং রিসালাত সম্পর্কে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে থাকে।

(২) জীবনের যে লক্ষ্য ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে তাকে নিজের জীবনে একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে।

(৩) আদর্শ প্রচারকের চরিত্রে এমন কোনো বৈষম্য থাকতে পারবে না যা তার দাবী ও আদর্শের পরিপন্থী।

(৪) যে কোনো কাজ করবে সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করবে- এতে অন্য কোনো স্বার্থ নিহিত থাকতে পারবে না।

(৫) ইসলামী আদর্শের এ প্রচারকার্য একটা আন্দোলন হিসেবে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে, কেননা সাময়িক কোনো তৎপরতার দ্বারা কোনো সুষ্ঠু ও স্থায়ী বিপ্লব সাধিত হতে পারেনা।

এ শর্তাবলীকে সম্মুখে রেখে যে ব্যক্তি এ বইটি অধ্যয়ন করবেন তিনি অবশ্য এথেকে উপকৃত হবেন।

আল্লাহর কাছে কামনা, তিনি যেন এ বইটি পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে উপযোগী করে অধমের শ্রম সার্থক করেন এবং একে অধমের জন্যে আখিরাতের সম্বল করেন। ইতি

সূচীপত্র

- মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক।। ৬
- নিজেকে সবাই ভালো মনে করে।। ৯
- মনের ঝাল প্রকাশ করা।। ১৭
- সমান ব্যবহার।। ২০
- হাস্যোজ্জ্বল চেহারা।। ২২
- কথা বলার ধরন।। ২৫
- গুণের সমাদর।। ৩০
- জয়-পরাজয়ের ভাব।। ৩৩
- নিম্নের একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।। ৩৬
- মানসিক প্রবণতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।। ৩৮
- যেসব ব্যাপারে মতের মিল রয়েছে।। ৪৩
- পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হোন।। ৪৪

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রত্যেক মানুষই অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করে। প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং সহচরদের সাথে কেউ তিক্ত এবং অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করতে চায় না। সকলেই অপরের প্রিয়পাত্র হতে ইচ্ছুক। তবে এটা কেউ কি ভেবেছে কোন দিন, মানুষের মধ্যে এ ভাবটি কেন বিরাজমান? অপরের কাছে ভালো বিবেচিত হবার জন্যে মানুষের মনে কেন এ প্রবণতা? গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এর একাধিক কারণ রয়েছে। প্রতিটি মানুষেরই সহজাত কামনা হলো অন্যের কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা, তার সম্পর্কে সবার মনে উচ্চ ধারণা থাকা। অপরের দৃষ্টিকটু হওয়া সকলের নিকটই পীড়াদায়ক। কাজেই মানুষের এ প্রবণতা দীনহীন ভিক্ষুক থেকে নিয়ে শাহানশাহ্ রাজাধিরাজ সকলের মধ্যে দেখা যায়। দোকানদার মনে করে মানুষের সাথে তার সম্পর্ক ভালো এবং ব্যাপকতর হোক। সবাই তাকে সৎ বলে বিবেচনা করুক। এতে তার ব্যবসার উন্নতি এবং প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিভাবে উকিল-মোক্তার চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, কারখানা মালিক এক কথায় মানব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই চায়— সমাজের মানুষের সাথে তার সম্পর্কের সীমা ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হোক, সকলেই তার সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করুক। বিশেষ করে যেদিন থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, দেশ এবং সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব এমন ব্যক্তিবর্গের হাতেই অর্পিত হতে হবে যাদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আস্থা রয়েছে সেদিন থেকেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভের প্রয়াস একটি স্বতন্ত্র আর্টে পরিণত হয়েছে। এমন অসংখ্য কৃত্রিম পন্থার উদ্ভব হয়েছে যার সাহায্যে একজন লোক অনায়াসেই সমাজে তার জনপ্রিয়তা এবং সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের মধ্যে তার সম্পর্কের পরিধি ব্যাপকতর করতে সক্ষম হয়। মোটকথা, কোন সময় প্রেম-প্রীতি, অর্থসম্পদের মোহ, আবার কোন সময় মান সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদার লালসা মানুষকে এজন্যে বাধ্য করে, যেন মানব-সমাজে তার সম্পর্ক ভালো এবং ব্যাপকতর হয় এবং সকলেই তার সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করে তাকে সুনজরে দেখে।

যুগ যুগ ধরে এ আকাংখা পূরণের জন্যে মানুষ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। দাওয়াত করে অপরকে খাওয়াচ্ছে, দরিদ্রের সাহায্যের জন্যে উপদেশ দিচ্ছে। নিঃসহায় নিঃসম্বলদের সমবেদনায় গদগদ কণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছে। কেউ অন্নহারা বস্ত্রহারাদের

ডাল-ভাতের দাবী নিয়ে কৃত্রিম মানব প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। চাষী-মজুর, সর্বহারাদের কাতারে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার নিয়ে সংগ্রামের অভিনয় করছে। অতঃপর গণ-সমর্থন আদায় করে গদী দখলের পথ করে নিচ্ছে। কখনো বা আদর্শ চরিত্রের অবতার সেজে মানুষের সামনে ধরা দিয়েছে, আবার কখনো বা ক্ষমতা বহির্ভূত ব্যাপারে হাত বাড়াচ্ছে। এমনিভাবে অসংখ্য উপায়ে মানব-সমাজে জনপ্রিয়তার পথ করে নিচ্ছে। মানুষের সাথে সম্পর্কের উন্নতি এবং প্রসারের ক্ষেত্রে অনেকের উদ্দেশ্য দিবালোকের ন্যায় সকলের সামনে ধরা পড়ে; স্পষ্ট বুঝা যায় সে কি উদ্দেশ্যে এ সম্পর্কের উন্নতি এবং প্রসার কামনা করছে। আবার অনেকের ব্যাপারে ধরা না পড়লেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে এ সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে তার কি মুখ্য উদ্দেশ্যে রয়েছে।

এতো গেলে সম্পর্ক স্থাপন, এর উন্নতি এবং সম্প্রসারণের ইচ্ছা ও কামনার একটা দিক। আসুন, এখন একজন সত্যিকার মুমিনের জীবনে এর রূপ এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ ভুপৃষ্ঠে আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং রাসূলের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী এমন একজন মানুষের ভূমিকা এক্ষেত্রে কি রূপ পরিগ্রহ করে এবং করা উচিত। এমন এক ব্যক্তি, যে তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সঠিকরূপে অনুধাবন করতে পেয়েছে, পার্থিব জগতের উন্নতি, মানমর্যাদা, অর্থসম্পদ অপেক্ষা আখিরাতের উন্নতির চরম কামনা যার অন্তরে শিকড় গেড়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তার ওপর অটল থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে ব্যক্তি আল্লাহর অপর বান্দার কাছে তার এ জীবন বিধানের দাওয়াত পৌছাতে ইচ্ছুক, যে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, তার স্রষ্টা ও মালিক তার ওপর এদায়িত্ব অর্পণ করছেন যে মানুষকে আল্লাহর এবং রাসূলের সত্যিকার আনুগত্যের দাওয়াত দিতে হবে এ দুনিয়ায় এমন এক পরিবেশ, এমন এক সমাজ গঠন করতে হবে যার বুনিয়াদ হবে খোদা-প্রদত্ত জীবন বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহ এমন ব্যক্তির জন্যে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সর্বাধিক কাজেই, যে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করেছে যে, তাকে মানুষের মন-মগজ পরিবর্তন করতে হবে, তাদের চিন্তাধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে, তাদের চিন্তা কল্পনার ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে। এক কথায় যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করে এবং চায় যে, মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগেই আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হোক তার জন্যে প্রথম পদক্ষেপেই মানুষের সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে স্থাপন এবং একে ব্যাপকতর করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে

মানুষের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক এমন যাবতীয় বিষয় থেকেও দূরে থাকা কর্তব্য। অর্থাৎ এমন সব ব্যাপারে থেকে দূরে অবস্থান করা আবশ্যক, যা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের পরিবর্তে উল্টো তিক্ততার সৃষ্টি করে।

মানুষের মধ্যে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো, আল্লাহর দ্বীনের ওপর যেকোন প্রতিকূল অবস্থা বা সংঘাতময় মুহূর্তে অটল-অবিচল থাকা, মানব জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা, এটা শক্তি প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের কাজ নয়; অথবা কোনোরূপ যাদু মন্ত্রের দ্বারাও একাজ সম্পন্ন হতে পারে না। দুনিয়ার অন্যান্য কাজের সংগে এখানেই এর পার্থক্য। গায়ের জোরে গুরু হওয়া এবং কাউকে পদানত করা অনেকটা সহজ হলেও কারো অন্তঃকরণ জয় করা মস্তবড় কঠিন কাজ। কোনো রাজ্যে জোরপূর্বক রাজত্ব করা এবং কোনো ধন ভান্ডার বল প্রয়োগে হস্তগত করা এক কথা কিন্তু কারো মনের রাজ্যে রাজত্ব করা বা চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করা তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার।

একই বস্তু ব্যবহার-পদ্ধতির বিভিন্নতার দরুণ ভালোমন্দ উভয় কাজে ব্যবহৃত হয়। ধরুন, একটা তালোয়ার ডাকাতের হাতে পড়লে মানব সমাজ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, আবার আল্লাহর পথে সংগ্রামী মুজাহিদের হাতে পড়লে শান্তির প্রতীকের রূপ ধারণ করে। তেমনিভাবে মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। একজন নিছক অর্থলোভী ও মর্যাদাকাংখী ব্যক্তির মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর এক উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং সত্যের পথে আহবানকারী ও আল্লাহর দ্বীনের প্রচারকারীর সম্পর্ক বাড়ানোর উদ্দেশ্য হয় এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। উদ্দেশ্যের এ বিভিন্নতার ফলেই আজ আমাদের কাছে একটার গুরুত্ব অন্যটার তুলনায় অনেক বেশী। সত্যের পথে আহবানকারীর জন্যে মানুষের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির গুরুত্ব বর্ণনার পর এই বলে বিষয়টি এখানে শেষ করা উচিত ছিল যে দ্বীনের প্রচারকদের জন্যে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাপক এবং উন্নত করার জন্যে সচেষ্টা থাকা কর্তব্য। কিন্তু কথাটি সবাই জানে সবাই বুঝে। তবু এ ব্যাপারে আরো বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমার মতে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে কে কিভাবে অগ্রসর হতে পারে এর একটা বাস্তব পন্থা উদ্ভাবন নিশ্চয় দ্বীনি কর্মীদের যথেষ্ট সহায়ক হবে। এর ফলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে বহু নতুন নতুন পথ তাদের সামনে খুলে যাবে। এ উদ্দেশ্যেই আমি আলোচ্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই।

নিজেকে সবাই ভালো মনে করে

এ ব্যাপারে আলোচনার পূর্বে মানব মনের কতিপয় দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, সঠিকরূপে রোগ নির্ণয়ের ওপরই উপযুক্ত চিকিৎসা নির্ভর করে।

১। স্বভাবতই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে। কোন ডাকাত, চোর অথবা খুনী সকলেরই নিজের সম্পর্কে এ ধারণা রয়েছে যে সে নিরপরাধী। কোনো জেলখানায় কয়েদীর সংগে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেই আপনি একথা বলতে বাধ্য হবেন যে হয় সকল কয়েদী পূর্ব থেকেই ঠিক করে নিয়েছে যে তারা সবাই নিজেদেরকে নিরপরাধ বলে প্রকাশ করবে, আর না হয় আপনাকে ধরে নিতে হবে— নিশ্চয় সরকার এদের ওপর প্রকাশ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। না বুঝে না শুনে এ সকল নিরপরাধ ব্যক্তিকে কারাগারে আবদ্ধ রেখেছে। অথচ এ দুটো ধারণার মধ্যে একটিও সত্য নয়। কারণ অনুসন্ধানে সেই আগের কথায় আসতে হয় যে, মানুষ নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে। যেমন, কোনো ডাকাত আজীবন নিপরাধ মানুষের গলায় ছুরি চালিয়েছে, নির্দয়ভাবে নিরীহ পথচারীকে হত্যা করেছে, মানুষের অর্থ সম্পদ লুট করে নিয়েছে, সেও নিজেকে দয়ালু এবং মানুষের উপকারী বলে মনে করে। তার দৃষ্টিতে সে মনে করে, লুণ্ঠিত মালের কিছু অংশ তো আমি দীনহীন ফকীর মিসকিনদের মধ্যেও দান করি এতে আর এমন কি হয়েছে? কোন হত্যাকারী হয়তো এজন্যে নিজেকে নিরপরাধ বলে মনে করে থাকে যে তার ধারণা অনুযায়ী সে নিছক আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গুলী বা অস্ত্র চালিয়েছে, আর ঐ ক্ষেত্রে সে তা করতেও পারে। অনুরূপভাবে কোন চোর, এই বলে নিজেকে নিরপরাধ মনে করে যে তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোথাও সে চাকুরী পাচ্ছে না আর সে এতো নিষ্ঠুরও নয় যে হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবে আর তার ছেলেমেয়ে না খেয়ে ক্ষুধার তাড়নায় তারই সামনে অকাল মৃত্যুবরণ করবে। কাজেই জীবন রক্ষার তাগিদে সে অপরের ঘরে চুরি করতে বাধ্য হয়েছে।

এভাবে প্রত্যেক অপরাধী ব্যক্তিই নিজের কাজকে বৈধ প্রমাণ করার জন্যে বিভিন্ন বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে। অপরাধীর সঙ্গে আলোচনা করলেই দেখা যাবে নিজের সাফাই ও পবিত্রতার সপক্ষে সে কিরূপ যুক্তির অবতারণা করে। এতো গেলো

সে সব লোকের কথা, যারা অপরাধী ও সাজাপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে দুনিয়ায় মানুষ অপরাধী বলে মনে করে। এ ছাড়া আরো যে সব লোক রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ-কারবারের মাধ্যমে যাদের সঙ্গে আমরা জড়িত, এ ক্ষেত্রে তারা কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা দরকার।

বড়ো ছোট যে কোন ব্যক্তিরই ধারণা এই যে, সে যা বলে সেটিই ঠিক এবং নির্ভুল। মানব মনে প্রথম জন্মগত দুর্বলতা হলো সে সব সময়ই নিজেকে নিরপরাধ বলে মনে করে এবং নিজের কাজকে মনে করে নির্ভুল।

২। আমরা দেখি একটি লোক— তা সে যত ভুলের মধ্যেই থাকুক না কেন, অন্য কেউ তার কাজে ছিদ্রান্বেষণ অথবা কোন ক্রটি নির্দেশ করলে, তা সে কখনো বরদাশত করতে পারে না। তাই দেখা যায়, যখনই কোন ব্যক্তির কোনরূপ ক্রটি বা দুর্বলতা নির্দেশ করা হয়, তখন ঐ ব্যক্তি রাগে ফেটে পড়ে এবং তার মধ্যে বিরোধিতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। যতো যুক্তিই তাকে দেখানো হোক না কেন, সে তার ক্রটি এবং দুর্বলতা ঢাকার জন্যে সাফাই গাইতে গিয়ে বহু রকমের যুক্তি প্রমাণ পেশ করবেই। এরও একমাত্র কারণ হলো— যেহেতু প্রত্যেকেই মনে করে যে তার মতই নির্ভুল।

এসব দুর্বলতাকে সামনে রেখেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আপনার কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করা কর্তব্য। আপনি কারুর দুর্বলতা এবং ক্রটি নির্দেশ করলেই সে আপনার কথা মেনে নেবে বা সংশোধনের জন্যে এগিয়ে আসবে, এটা কিছুতেই মনে করবেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন লোকের সংগে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবে যে নিজেকে হয়তো মনে করে সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত এবং তার মত এবং পথকে সে সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে হয়তো বহু যুক্তি প্রমাণও খুঁজে বের করবে। এমনকি যুক্তি সংগত কিছু উত্থাপন না করতে পারলেও তবু বারবার একথা বলার চেষ্টা করবে যে, আমার কথা আপনার যুক্তি প্রমাণের তুলনায় একেবারে নির্ভুল না হলেও নেহায়েত অযৌক্তিক বলেও উড়িয়ে দিতে পারবেন না। এ অবস্থায় আপনি তাকে সংশোধনের যতো চেষ্টাই করুন না কেন সে কিছুতেই তা গ্রহণ করবে না বরং ক্রমশঃ আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। ফলে আপনার মধ্যে নৈরাশ্য ভাবের উদয় হবে। আপনি মনে করতে থাকবেন যে সৎ কাজের আদেশে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিঃস্বার্থ কাজে এরূপ জটিলতার সৃষ্টি সত্যিই বিরক্তিকর। কেননা, যে

ক্ষেত্রে আপনার একান্ত ইচ্ছা থাকে মানুষের সঙ্গে নিকটতর এবং প্রীতিকর সম্পর্ক স্থাপন করা যার সাহায্যে আপনি সুষ্ঠু চিন্তার খোরাক দিতে এবং তাদের ভুল পথ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবেন, সে স্থলে যখন পূর্বেকার সম্পর্কটুকুও বিনষ্ট হতে থাকে, তখন নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই দেখা যায়, কোন ব্যক্তি দু'একবার এ ধরনের বিরক্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হলে পরবর্তীতে মানুষের আস্থা হারানোর ভয়ে কোন অন্যায় বা অসৎ কাজের প্রতি দৃষ্টি পড়লেও সে দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় এবং বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলে থাকে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করে লাভ কি, এসব লোকও কি কোন কথা শুনবে?

এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা, কোন মতবাদ বা আদর্শ প্রচারকারী যদি এ ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাহলে দুনিয়ার মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ভাবধারার বিরোধী কোন নতুন বিষয়ই উত্থাপন করা সম্ভব হবে না। ফলে অন্যায়, অবিচার, জুলুম-অত্যাচারে জর্জরিত এ বিশ্ব জাহানকে সংশোধন এবং সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে যে কোনো প্রচেষ্টা, যে কোনো আন্দোলনের ধারাই চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। বরং আদর্শ প্রচারকারীকে প্রথমেই ভেবে নিতে হবে যে, কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করলে সে মানুষের মধ্যে আস্থাভাজন হতে পারবে। অবশ্য ব্যক্তি, স্থান ও কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। কেননা, পরিবেশ এবং রুচির বিভিন্নতার দরুন অনেক সময় একই কর্মপদ্ধতি সর্বত্র কার্যকরী হয় না। এমনিভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে এবং মানুষের হৃদয়ে স্থান করতে পারলে, তারা শুধু কানের সাহায্যেই শুনবে না সত্য প্রচারকের কথা শোনার জন্যে তাদের হৃদয় মনও ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

এখন প্রশ্ন হলো, মানুষের মন জয় করার পন্থা কি? এ ব্যাপারে মজ্জাগত যে ব্যাধির কথা ওপরে বর্ণিত হয়েছে, তা স্মরণ রাখাই যথেষ্ট। অর্থাৎ ছোট-বড় যতো রকম অপরাধই হোক, মানুষের প্রকৃতিই হলো এই যে, সে নিজের ভুল কখনই স্বীকার করতে রাজি হয় না। প্রতিটি ভুলকে নির্ভুল প্রমাণ করার জন্যে একটা না একটা যুক্তি তার থাকবেই। এমতাবস্থায় আপনার প্রথম দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করা এবং অকপটে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করা।

একাধিকবার মেলামেশার মাধ্যমে আপনি তার মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন। আপনাকে দেখতে হবে এ ব্যক্তির অসংখ্য দোষত্রুটির মধ্যেও কি কি

সদগুণাবলী রয়েছে। কেননা পৃথিবীতে এমন লোক অতি বিরল, যার মধ্যে কোনো সদগুণ নেই এবং শুধু অসদগুণাবলীতে সে পরিপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি যতোই অসৎ চরিত্রের হোক না কেন, তার মধ্যে সদগুণ নিশ্চয়ই কিছু থাকবে। আপনি তখন সকল দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তার সদগুণাবলীর প্রতিই লক্ষ্য করবেন এবং এ জন্যে তার প্রশংসা করবেন। তবে এ পদ্ধতিতে সম্পর্ক স্থাপনকালে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এটা তোষামোদ বা ছলচাতুরীর রূপ ধারণ না করে। বরং তার সদগুণাবলীর প্রশংসা আপনাকে দরদ এবং আন্তরিকতার সংগে করতে হবে, যা সত্যি সত্যি তার মধ্যে রয়েছে। আপনি সত্যি যদি আন্তরিকতার সংগে তার সদগুণাবলীর প্রশংসা করে থাকেন, তাহলে সে নিশ্চয়ই আপনার নিকট তার সব কথা অকপটে ব্যক্ত করবে এবং ক্রমশঃ আপনাকে আপনজন বলে ভাবতে শুরু করবে, আর মনে করবে একজন সত্যিকার সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে। এর কারণ হচ্ছে, মানুষ স্বভাবতঃই চায় তার স্বীকৃতি দিক। প্রশংসা অর্জনের এ একান্ত বাসনা যে কোনো মানুষের মধ্যেই অল্প-বিস্তার রয়েছে। এসব বাস্তব বিষয়কে সম্মুখে রেখেই কাজ করতে হবে। স্মরণ রাখা দরকার, এমন কর্মী দ্বারা কখনও সমাজের কোনরূপ সংস্কার বা মঙ্গল সাধনের আশা করা যেতে পারে না, যে সর্বদা নিজেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করবে আর সমালোচনা করবে অপরের যাবতীয় দোষক্রটির।

এভাবে সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা কারো হৃদয় জয় করার পর আপনি মনে করতে পারেন যে, এব্যক্তি দ্বারা এখন কিছু সৎ কাজ করানো সম্ভব হবে। এখন যদি আপনি সহানুভূতির সংগে তার চরিত্রের এমন কোনো দোষ-ক্রটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেন, যা পরিহার করা তার জন্যে তেমন কিছু অসুবিধাজনক নয় তাহলে সে অনায়াসেই তা সংশোধনের জন্যে এগিয়ে আসবে এবং আপনার যে কোনো পরামর্শ বা সদোপদেশ গ্রহণ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করবে না। অনুরূপভাবে তার এ সত্যোপলব্ধি এবং সংশোধনী গ্রহণ করার মনোভাবেরও যদি আপনি প্রশংসা করেন তাহলে দেখতে পাবেন আরো দ্বিগুণ উৎসাহ-প্রেরণা নিয়ে সে দিনের পর দিন সত্যের দিকে অগ্রসর হয়ে চলছে এবং ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে তার মধ্যে এক নতুন শক্তি ও প্রেরণার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনিভাবে ধৈর্য ও সহানুভূতির সংগে সংস্কার ও সংশোধনের কাজে এগিয়ে আসলে ইনশাআল্লাহ অল্পদিনের মধ্যেই সে ব্যক্তি সত্য পথের সন্ধান লাভ করবে। আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রচারককে স্মরণ রাখতে হবে যে,

কারো মন-মগজকে পরিশুদ্ধ করা মোটেই ছেলে খেলা নয়। ছলচাতুরীর দ্বারা কাউকে উচ্চ মর্যাদা থেকে অপসারণ করে অপদস্ত করার জন্যে যে কোনো একটি সাধারণ প্রতারণামূলক চালবাজীই যথেষ্ট। কিন্তু নৈতিক অধঃপতনের অতল গহবর থেকে হাতে ধরে কোনো মানুষকে মানবতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করতে হলে চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন। এ জন্যে সত্যিকার সহানুভূতিশীল ব্যক্তিকে শরীরের রক্ত পানি এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।

সার কথা হলো ঃ আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে মানুষের মনে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে হলে ন্যায়সঙ্গতভাবে মানুষের চরিত্রে যে সদগুণাবলী রয়েছে, তাকে প্রথম অবলম্বন হিসেবে বেছে নিতে হবে এবং সেগুলোকে যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে। কারো তোশামোদ করা এবং সত্যিকার প্রশংসা করার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এসব বিষয়কে সর্বদাই সম্মুখে রেখে কাজ করতে হবে। কোনো মানুষের সদগুণাবলী এবং সৌন্দর্যের আলোচনা আপনার নিজের মধ্যেও এক সহানুভূতির উদ্রেক করবে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সৎকাজে আহবান এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার কাজ যদি সহানুভূতির সংগে না করা হয়, তাহলে কোনো সদোপদেশ কার্যকরী হয়না। যেসব সদগুণাবলী মানুষ নিজের মধ্যে সহজেই পয়দা করতে পারে সর্বপ্রথম তাকে সেদিকেই আহবান জানাতে হবে।

মানুষের সংগে সম্পর্কোন্নয়নের ব্যাপারে এ পর্যন্ত বেশ কিছু প্রস্তাব আপনাদের সম্মুখে উত্থাপন করা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে এ বিষয়ের প্রতিও তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে প্রচারক কর্তৃক এমন কোনো ভূমিকা গ্রহণ না করা হয়, যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং উন্নয়নের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং ছিন্ন হওয়ায় উভয় কারণকে সম্মুখে রেখে কাজ করলে এ ব্যাপারে আরো বহু ফল লাভের আশা করা যেতে পারে। কি কি কারণে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন বিঘ্নিত হয়, তা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে যে কেউ উপলব্ধি করতে পারে। তবে সাধারণতঃ যে সকল কারণে সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয় তার সংক্ষিপ্ত কারণসমূহ হলো নিম্নরূপ ঃ

১. কম বেশী এ দুর্বলতাটুকু সকলের মধ্যেই দেখা যায় যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু দেখেই মানুষ ক্রুদ্ধ হয়। বিশেষ করে ঘরের চাকর-চাকরানী, ছেলে-মেয়ে এবং নিজের ছাত্র-ছাত্রীরাই বড়দের রোষানলের সম্মুখীন হয়ে থাকে বেশী। কিন্তু সম্পর্কোন্নয়ন ক্ষেত্রে অন্যান্য গুণাবলীর মতো ক্রোধকেও আয়ত্তাধীন করা কর্তব্য। কথায় কথায় বদমেজাজী এবং খিটখিটে ভাব দেখানো

হলে কেউ আপনার সংস্পর্শে আসবে না এবং আপনার সংগে মেলামেশার ইচ্ছা করবে না। ফলে খুব শীঘ্রই এ দুর্বলতার প্রতিক্রিয়া নিকটতম পরিবেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং অবশেষে আদর্শ প্রচারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এরই ফলে আদর্শ প্রচার বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে এমন অনেক লোককে দেখা যায়, যারা নিজেদের বদমেজাজী এবং অসদাচরণের দরুন নিজ পরিবেশে আশানুরূপ কৃতকার্য হতে পারেনা।

২. নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী, সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত লোকের সংখ্যা সমাজে অতি বিরল। সহকর্মী এবং দৈনন্দিন কাজে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে আদান-প্রদান এবং কাজকারবারে— যেকোন ব্যক্তিরই হোক না কেন অল্পবিস্তর ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। তবে এটা মানুষের স্বভাবজাত যে, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি অপেক্ষা অপরের দোষত্রুটির প্রতিই দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ হয়ে থাকে। একে অপরের মধ্যে সামান্যতম দুর্বলতার সন্ধান পেলেই অমনি সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। কাজেই, যেহেতু প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে থাকে, তাই একে অপরের ত্রুটি নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার অনুভূতিতে ভীষণ আঘাত অনুভূত হয়। এ কারণে অসাবধানতার সঙ্গে কারো ত্রুটি নির্দেশ বা কোনো রূপ সমালোচনা পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষভাবে ক্ষতি সাধন করে। এক কথায় মানুষকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকালে তাদের সকল দোষত্রুটিকে উপেক্ষা করতে হবে এবং প্রথম অবস্থায় তার যাবতীয় সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে। সমালোচনা থেকে বিরত থাকার অর্থ এটা নয় যে তার যাবতীয় দুর্বলতা এবং দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি এড়িয়ে তার সঙ্গে সব সময়ের জন্যে সম্পর্ক কায়েম করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যে সকল মানুষের মধ্যে কোনরূপ দুর্বলতা বা দোষত্রুটি রয়েছে এবং সংশোধনকারীও স্বয়ং সে সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, এমতাবস্থায় এ বিষয়ে বারংবার আলোচনা না করা। কেননা, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশোধিত হবার চাইতে বিদ্রোহী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে।

৩. মানুষকে এ ধারণা সত্যিই আনন্দ দেয় যে, সে যাবতীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। অথচ কোন মানুষই এ দাবী করতে পারে না যে, তার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা বা দোষত্রুটি নেই। কিন্তু এসত্ত্বেও মানুষ চায় যে অন্ততঃ নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণাটুকু ভালো থাকুক। মানুষের আত্মতুষ্টি লাভের এ প্রবণতার অভিব্যক্তি বিভিন্নরূপে ঘটে অপরের দুর্বলতাকে ঘৃণাভরে উন্নাসিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, কাউকে বোকা প্রমাণ করে, কারো অদূরদর্শীতা বা

বুদ্ধিহীনতার দিকে ইঙ্গিত করে এবং এমন হাবভাব বা বর্ণনাভঙ্গী করে, যাতে নিজের মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। তার কারণ মানুষের এ ধরনের ভূমিকা তার মনে এক বিশেষ তৃপ্তির যোগান দেয়। এ জন্যেই নিজের দুর্বলতাকে ঢাকার জন্যে মানুষ অসংখ্য উপায় অবলম্বন করে। আপনি অপরকে সংশোধনের দায়িত্ব পালন করছেন। নিশ্চয়ই এটা ভাল কাজ। কিন্তু উপরোক্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করলে সত্যিকার সংশোধন তো দূরের কথা, সংশোধনের পথই সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠবে। ফলে আপনার কথা শুনে মানুষের অন্তঃকরণ সিক্ত হওয়ার পরিবর্তে পাথরে পরিণত হবে এবং তারা পরিণত হবে 'বদ্ধ তালায়'।

৪. নিজেকে বড় এবং অপরকে ছোট মনে করাতে আমরা বেশ তৃপ্তি অনুভব করে থাকি। এজন্যেই অপরের অগোচরে আমরা তার দোষক্রটির আলোচনা করি। অর্থাৎ কোনো সময় চাপ প্রদানের ভয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে যদি আমরা কারো সম্মুখে তার সমালোচনা করার সুযোগ না পাই, তাহলে অন্য সময় তার অগোচরে আমরা তা প্রকাশ করি কিংবা মনের এ ভাব এমন ভঙ্গীতে ব্যক্ত করে থাকি যাতে বাহ্যতঃ মনে হয় যেন ঐ ব্যক্তির সংশোধন অত্যাধিক কাম্য ছিল; ঐ ব্যক্তির জন্যে মনে হয় বক্তা অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করছেন। অথচ এতে আসল উদ্দেশ্য হয় সেই ব্যক্তিকে খাট করা। এভাবে অন্যের অগোচরে এমনি অথবা সহানুভূতির সুরে তার দুর্বলতার আলোচনা করে এরূপ তৃপ্তি অনুভব করা নিজের ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখানোই হয় এক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্য। এটা কুরআন বর্ণিত 'গীবতে'র অন্তর্ভুক্ত। গীবত থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আল কুরআনে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সম্পর্ক বিনষ্ট করার ব্যাপারে গীবতের বিরাট প্রভাব রয়েছে। গীবতের ব্যাপারে কেবল এটাই ক্ষতিকর নয় যে, আপনি অন্যের অবর্তমানে তার দোষক্রটি বর্ণনা করাতে তার প্রতি আপনার এবং অপরাপর শ্রোতার বীতশ্রদ্ধা ভাব সৃষ্টি হবে, বরং যার গীবত করা হয়েছে, সেও এসব কথা জানতে পারলে আপনার বিরুদ্ধে তার অন্তঃকরণে ঘৃণার উদ্রেক হবে। ফলে এভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক তো বিনষ্ট হবেই, এছাড়াও বহু অঘটন ঘটারও সম্ভাবনা দেখা দেবে। মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যে তাই গীবত থেকে কঠোরভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সমাজের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার এ হলো ক'টি বিশেষ বিশেষ কারণ। একদিকে এ সকল ব্যাপারে অসতর্ক থাকা এবং অপরদিকে সম্পর্কোন্নয়নের আশা পোষণ করা, এরূপ পরস্পর বিরোধী পদ্ধতিতে কিছুতেই

কৃতকার্য হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য এটা সত্য যে, উপরোল্লিখিত দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়, তবে এ ধারণাও ঠিক নয় যে, এ জাতীয় দুর্বলতা সংশোধনের উর্ধে। নিশ্চয়ই এথেকে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। এজন্যে কেবল ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর সংকল্পেরই প্রয়োজন। মুমিনের সংশোধনের জন্যে তওবাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তওবা বলতে আমরা বুঝি আমাদের কৃত অপরাধের জন্যে অনুতাপ-অনুশোচনা দ্বারা সহজভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং ভবিষতে কোনো গর্হিত কাছে প্রবৃত্ত না হওয়ার জন্যে তার কাছে কঠোরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা চাই আমাদের সত্যিকার মালিক ও প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে।

যে সকল দোষক্রটির বিষয় ওপরে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো কারুর চরিত্রে দেখা দিলে যে ক্ষতি সাধিত হয়, সেদিকে কিছুটা ইংগিত ইতিপূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। ফলে মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াতে পৌছানো বড় কঠিন হয়ে দায়। কিন্তু যেসব মানুষের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার প্রতিই নিবদ্ধ, দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, মান-মর্যাদা, যশ-গৌরব অর্জনই যাদের জীবনের চরমতম লক্ষ্য, তারাও তো এসব দোষক্রটি এবং এর প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা সব রকমের চেষ্টাচরিতও করে। এমন অনেক লোক রয়েছে যারা নেতৃত্ব ফলাবার, ব্যবসায় সম্প্রসারণ করার অথবা পার্থিব কোনো মর্যাদা লাভের আশা ছাড়া জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্যই রাখে না, তারাও তো এসব দোষক্রটির অপকারিতা সম্পর্কে জানে এবং এথেকে বাঁচার জন্যে অনবরত চেষ্টা করে থাকে। এদেরকে দেখেও আমাদের শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছু রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা যদি এ জাতীয় দুর্বলতা এবং দোষক্রটির অপকারিতা থেকে বাঁচার জন্যে কঠোর সংকল্প গ্রহণ করতে পারে এবং হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে যাবতীয় মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত করতে পারে, তাহলে এদের চেয়েও উচ্চতর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সংগ্রামকারীদের ভূমিকা কিরূপ হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়। যে ব্যক্তি নশ্বর জগতকে উপেক্ষা করে অনন্ত জগতের অধিকারী হওয়ার অভিলাষী, সে এ সকল দোষক্রটি থেকে নিজেকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে অগ্রসর হলে নিশ্চয়ই তার মধ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হবে।

মনের ঝাল প্রকাশ করা

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার বহুবিধ কারণ থাকে। এর মধ্যে মানুষের প্রকৃতিগত উত্তেজনার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যে কারণে এ সম্পর্ক একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অনেক বিষয় আছে, যা অপছন্দ হবার কারণে মানুষ তার বিরুদ্ধে ইচ্ছা পুরিয়ে নানাভাবে মনের ঝাল মিটতে চায়। এ উদ্দেশ্যে সে বহুতর উপায় অবলম্বন করে। ক্রোধ, কটু কথা, ত্রুটি অনুসন্ধান, কারো পেছনে দোষ বর্ণনা ইত্যাদি এমন অনেক উপায় আছে, যার উদ্দেশ্য মনের ঝাল প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই নয়। মানুষের এ জাতীয় মানসিক অবস্থাই তাকে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে এবং অপরের দোষত্রুটিকে ফলাও করে প্রকাশ করতে বাধ্য করে। মোটকথা, মানুষ তার এ মানসিক প্রবণতার দরুন নানাবিধ নৈতিক দুর্বলতায় জড়িত হয়ে পড়ে। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার খাতিরে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কদাচিৎ নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্যে যেন এ প্রবণতার আশ্রয় না নেয়া হয়। এ মানসিক অবস্থার উদ্ভব হলে, তার দ্বারা এমন সব কাজ অনুষ্ঠিত হয় যার ফলে মানুষের মন তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যকার দুরত্বও বেড়ে যায়। এ মানসিক প্রবণতাকে সংযত রাখার জন্যে বিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে সম্মুখে রাখা হলে 'আদর্শ' প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কামিয়াবির আশা করা যেতে পারে।

কারুর প্রতি দোষারোপ করা অত্যন্ত সহজ। কোনো ব্যাপারে কাউকে অভিযুক্ত করতে কোনো বেগ পেতে হয় না, কিন্তু নিজেকে অভিযুক্তের পর্যায়ে ফেলে বিচার করাটা অত্যন্ত সুঃসাধ্য ব্যাপার। অপরের দোষত্রুটি অনুভব করার পর সুস্থ মস্তিষ্কে নিজেকে একবার তার স্থানে রেখে অবস্থা পর্যালোচনা করুন। অবশ্য এটি হবে বীরত্বের পরিচায়ক। এমতাবস্থায় আপনি দেখতে পাবেন শতকরা আশি ভাগ অভিযোগ— যা আপনি অন্যের ওপর আরোপ করছেন, তার প্রত্যেকটারই একটা যুক্তিসংগত কারণ আপনি নিজেই বের করবেন। অপরের চরিত্রের ন্যায় নিজের চরিত্রকেও এমনিভাবে 'সমালোচনার দূরবীন' দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে একদিকে যেমন নিজের সংশোধনের পথ সুগম হবে, তেমনি অন্যদিকে অপরের ছিদ্রান্বেষণ এবং তাকে অভিযুক্ত করার প্রবণতা থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে, যা পারস্পরিক সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

তবে তার মানে এই নয় যে, সমাজ-সংশোধনের সকল প্রকার কাজ থেকে হাত

গুটিয়ে বসে থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। আর এর অর্থ এও নয় যে, যে কোনো অপকর্মকে বরদাশত করার অভ্যাস করতে হবে। বরং নিজের চরিত্রকে এমনি তুলনামূলকভাবে যাচাই করাতে সার্থকতা হচ্ছে এই যে, যখন আপনি নিজের প্রতি লক্ষ্য রেখে অপরের দোষত্রুটি বিচার করবেন তখন আপনি তার সংশোধনের জন্যে এমন পন্থাই গ্রহণ করবেন যাতে করে মনে হয় যেন আপনি নিজের সংশোধনে এগিয়ে আসেন। এটা স্পষ্ট কথা যে এমনিভাবে অপরের অবস্থা সংশোধনে যে দরদ এবং আন্তরিকতা আপনার নীতিতে স্থান পাবে তার গুরুত্ব নিশ্চয় অনেক বেশী এবং এর প্রভাবও সুদূরপ্রসারী। এতে মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বদা মধুরতর থাকবে এবং সমাজ সংস্কারের সুসঙ্গত পন্থার উদ্ভব হবে। আপনার সম্মুখে রয়েছে একটা মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সর্বদাই আপনি মানুষের মনকে নিজের নিকটবর্তী করতে চান। তাই আপনি নিজের দোষত্রুটি নিজের যে কোন দুর্বলতার প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখতে পারেন। সেগুলোর সংশোধনে এগিয়ে আসতে পারেন। কুপ্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হতে পারেন এবং নিজের মানসিক প্রেরণাকে নিজেই পিষ্ট করতে পারেন। কিন্তু আপনার শ্রোতার অবস্থা তো আর তেমন নয়। তার সামনে নেই কোনো উন্নততর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। আপনার মতো তার ভেতরের মানুষটা এতোসব বাধ্যবাধকতা, নিয়ম-কানুন মেনে চলার কোনো কারণ খুঁজে পায় না। কাজেই আপনার শ্রোতা থেকে অনেক সময় এমন বহু কিছু প্রকাশ পায় যা আপনার মনঃপুত নয় এবং আপনার জন্যে হয় যথেষ্ট পীড়াদায়ক। মানুষ চায়, সে যদি কারুর সঙ্গে নম্র এবং ভদ্র ব্যবহার করে, তাহলে প্রত্যুত্তরে তার সঙ্গেও সে অনুরূপ ব্যবহার করুক। সে যদি নিজের ক্রোধ ও আবেগকে সংযত রাখে, তাহলে অপরজনও যেন তার ক্রোধ-আবেগকে বেলাগাম না করে।

অনেক লোক আছে, যারা অপরকে সংশোধন করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে যে, আমরা সবকিছু করে ফেলতে চাইলে কি হবে শ্রোতাদেরও তো এদিকে কিছু ঝোঁক থাকা চাই। এদ্বারা তারা বলতে চায় যে, আমাদেরকে যে বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে আমরা তো সে অনুপাতে কাজ করে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; তার সঙ্গে সঙ্গে এ শর্তও তারা আরোপ করছে যে শ্রোতাকেও সে উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই এ ধরনের উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

আসল কথা হলো, যাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক, তারা মূলতঃ কেবল কল্পনাপ্রবণ মানুষ নয় এবং তাদের কর্মপ্রবণতাও আপনার ইচ্ছার অনুগত নয় যে আপনি

যখন যা বলবেন তখন তাই হয়ে যাবে। বরং আপনাকে যা কিছু করতে হবে তা এমন সব লোকের মধ্যে করতে হবে যারা বিভিন্ন মেজাজ ও বিভিন্ন ভাবাবেগের অধিকারী। এমনও হতে পারে আপনার শ্রোতা মস্তবড় জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী। আপনি তার কাছে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করছেন না। যার ফলে আপনার শতকরা বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না। আপনি যেভাবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী শ্রোতাকে নিজের বক্তব্য বুঝাতে চেষ্টা করেছেন সে কিছুতেই মানতে রাজী হচ্ছে না। কেননা যাদের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যেও ভাবাবেগ আছে, গর্ব অহংবার, বিদ্বেষ ও হঠধর্মীতাও আছে। পূর্ব পুরুষদের রীতি-নীতির ওপর তারা অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করে বসে আছে। এমতাবস্থায় আপনার যদি এমন কোনো ভূমিকা প্রকাশ পেয়ে যায় যার ফলে তাদের মনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তাহলে মনে করতে হবে, আপনি নিজ হাতেই নিজের সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিয়েছেন। আপনাকে সর্বদা এ জন্যে সতর্ক থাকতে হবে যে, আপনার থেকে যাতে কোনো কাজ না ঘটতে পারে যাতে অপরের অহমিকায় আঘাত লাগে এবং তার আত্মগৌরব, পক্ষপাতিত্ব, গোঁড়ামি ইত্যাদি পশু-বৃত্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, তার বিশ্বাসগুলো প্রত্যক্ষ আঘাতের মুখোমুখী হয়।

আপনি হয়তো বর্ণিত উপদ্দেশাবলীর ব্যবহারিক পদ্ধতি সম্পর্কে ইতস্তত করছেন যে তাহলে মানুষের মধ্যে উল্লেখিত দুর্বলতা থাকা অবস্থায় কিভাবে তার সংশোধন করা যাবে? তার অহঙ্কার-আত্মম্ভরিতার কি প্রশংসা করবো? কিংবা তার বিদ্বেষ, হঠধর্মীতা এবং যাবতীয় অন্ধ বিশ্বাসকে সঠিক বলে মেনে নেবো? নিশ্চয় নয়। কেননা এটা একদিকে যেমন আদর্শ প্রচারকারীর মর্যাদার পরিপন্থী, অন্য দিকে তেমনি তার মূল লক্ষ্যের জন্যেও একান্ত ক্ষতিকর। বরং এখানে যে ব্যাপারে আপনাকে বিরত থাকার কথা বলা হচ্ছে তার মূল কথা হলো ঃ আপনি এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব করবেন না, যাতে তাদের হীন প্রবণতা আহত হয়। মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে কি করা উচিত বা কি উচিত নয়— এর ফয়সালা আপনাকে প্রতি পদে পদে করতে হবে। কারণ এতে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ ভুলের একাধিকবার পুনরাবৃত্তিও ঘটতে পারে। কিন্তু প্রতি পদে পদে যদি আপনি আপনার কাজের প্রতিক্রিয়ার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হতে থাকেন, তাহলে আপনার একটা ভুল নিজের অভিজ্ঞতায় এক নতুন সংযোজনার সৃষ্টি করবে। অতঃপর আপনি যদি এসব ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা একত্রিত করেন তাহলে তা আপনার জন্যে একান্ত উপকারী ও বাস্তব

পরামর্শে পরিণত হবে। এক কথায় যারা অপরের চিন্তাধারা, মতামত এবং ভাবাবেগের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে অন্যের দৃষ্টিভংগী হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করা উচিত।

সমান ব্যবহার

আদর্শ প্রচার এবং সংস্কারমূলক কাজের প্রথম পরিসর হলো প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটতম পরিবেশ, যেখানে সে বসবাস করে চাকুরী করে অথবা অন্য কোনো ব্যাপারে অবস্থান করে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকই আদর্শ প্রচারের ব্যাপারে নিজেদের এ স্বাভাবিক পরিবেশে কৃতকার্য হতে পারে। এর একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। তা হলো এই যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এমন একটা গণ্ডি থাকে যেখানে সে একজন সর্দার বা নেতার মর্যাদা পেয়ে থাকে, তার গৃহ স্ত্রী-পুত্র কর্মচারী চাকর-চাকরাণী অনুসারী ভক্ত-অনুরক্ত ইত্যাদি বহু লোক তার কর্তৃত্বাধীনে থাকে। তাদের মধ্যে তার বিরাট প্রাধান্য এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে তাদের মধ্যে অর্থাৎ তার নেতৃত্বের প্রভাব দ্বারা কাজ নিতে চেষ্টা করে। প্রয়োজনবোধে জোরজবরদস্তি ও ভীতি প্রদর্শনের পথেও সে পা বাড়ায়। মোটকথা, নিজের ব্যক্তিত্ব বলে প্রতিষ্ঠিত প্রভাব প্রয়োগে সে এ ক্ষেত্রে কিছুতেই বিরত থাকতে চায় না। এরূপ ভূমিকার পরিণতি সুস্পষ্ট। কেননা মানুষের চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ মতের পরিবর্তন এবং কারুর ইচ্ছাশক্তিকে নিজের সপক্ষে আনা এত সহজ ব্যাপার নয়, যে জোরজবরদস্তি বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি তা সে আপনার অধীনস্তই হোক না কেন, তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। আপনার স্ত্রী-পুত্র চাকর, পরিচারিকা, কর্মচারী যারা একটা বিশেষ নিয়ম শৃংখলার মাধ্যমে আপনার আনুগত্য করতে বাধ্য। তাদের ব্যক্তিগত মতামতকে নিজের মতের অধীন করার ব্যাপারে কিন্তু এ বাধ্যতা যথেষ্ট নয়। কেননা তাদেরও একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধ রয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে তাদের মতামতেরও বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। তাদের মনের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেবার সময় বিনা যুক্তি-প্রমাণে তারা তা মানতে প্রস্তুত হয় না। তাদেরকে সন্তোষজনক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় বিনা যুক্তিতে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে গেলে যে ফল দাঁড়ায় এখানেও সে পরিণতি দেখা দিতে বাধ্য। কারণ তাদের মধ্যেও এমন সব প্রবণতা বর্তমান আছে বাইরের জগতে যা আপনি সচরাচর প্রত্যক্ষ করে থাকেন। আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে সত্যিই এটা একটা জটিল

পর্যায়ে। কেননা এ স্থলে আপনার মধ্যে নিজের গুরুত্ব এবং ব্যক্তিত্ববোধ বর্তমান থাকে। আপনি এ ক্ষেত্রে নিজের জন্যে একটা আসন নির্ধারিত করে নিয়েছেন। সেখান থেকে নিচে অবতরণের কথা আপনি চিন্তাও করতে পারেন না। অথচ বুদ্ধি-বিবেচনার কথা হলো এই যে, আপনাকে নিজের নিকটস্থ ব্যক্তিদের সংশোধনের জন্যে.এমন পর্যায়ে নেমে আসতে হবে, যা এ কাজের জন্যে একান্ত আবশ্যক। এখানে এসে হয়তো আপনি এক সমস্যায় পড়ে যান। কারণ একদিকে আদর্শ প্রচারের কলা-কৌশল বজায় রাখা, অপরদিকে ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্ন। কিন্তু তবুও এ ক্ষেত্রে আপনার কাছে দ্বীনের দাবি হলো এই যে, আপনি এ জাতীয় পরিবেশে নিজেকে অন্যের সমপর্যায়ে নিয়ে আসবেন এবং সকলের সঙ্গে আন্তরিকতার সাথে কথাবার্ত বলবেন ও মেলামেশা করবেন। তাদেরকেও নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দান করবেন যদিও উচ্চ মর্যাদাবোধ আপনাকে তা করার অনুমতি দেয় না। আদর্শ প্রচারের কৌশল এটাই চায় যে, আপনি যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে নিজের নিকটস্থ ব্যক্তিদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে যেহেতু আপনি এ ধরনের আচরণে অভ্যস্ত নন, সর্বদাই তাদের ওপর ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আপনার মতামত চাপিয়ে আসছেন, তাই এখানেও আপনি চাইবেন যে, টু-শব্দটিও না করে নীরবে আপনার প্রাধান্যকে মেনে নিতে হবে। অথচ দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্নে আপনার এ মনোভাব পরিহার করা অপরিহার্য। অপরের মতামত এবং ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু অনেকে এ কথা ভুলে গিয়ে অন্যান্য কাজকর্মের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে প্রস্তুত থাকে না।

এ কয়টা বিশেষ বিশেষ কারণেই নিজের নিকটতম পরিবেশেও প্রচারক নিজেকে 'উপেক্ষিত আগন্তুকের' পর্যায়ে ফেলে দেয়। এতে হয়তো আপনার মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে যদি উল্লেখিত উপদেশাবলী পালন করা হয় তাহলে অন্যান্য ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কারণ গৃহকর্তা বা বড় অফিসার হিসেবে মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে চলনে-বলনে আপনাকে এ বিশেষ একটা মেজাজ গ্রহণ করতে হবে। আবার আদর্শ তথা দ্বীনের প্রচারকল্পে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে অন্য রকম ভংগী। এ রকম দু'মুখো নীতিকে আপনি আত্মস্থ করতে পারবেন না। সে সময় আপনার আদর্শ প্রচারের ধরন কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে। অথবা অধীনস্থ বা নিজ পরিবারের লোকদের ব্যাপারে আপনি সতর্কতা অবলম্বন করতে চাচ্ছেন

তা হয়ে পড়বে অন্তঃসারশূন্য। আপনার এ জটিলতাটি বাস্তবভিত্তিক এতে সন্দেহ নেই। অবশ্য কোনো ব্যক্তির জীবনে দু'মুখো নীতি কার্যকরী হতে পারে না এবং আপনিও সফলতা লাভ করতে পারবেন না, কিন্তু তবুও এখানে এটা বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করার আছে। তা হচ্ছে আপনি নিজের জীবনের যে পর্যায়ে এ ভয়ভীতি এবং বাধ্য-বাধকতার নীতি অবলম্বন করে আছেন তা কি সত্যিই আপনার জন্যে জরুরী? এটা না হলেই কি নয়? আসলে এ ব্যাপারে আপনার পয়লা নম্বরের ভুলটি হচ্ছে এখানেই। আপনি জীবনের এ অংশটিতে নিজের আসন এখানেই নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু মূলতঃ আপনার এ ভূমিকা এ ক্ষেত্রেও সত্যিকার সফল বা প্রশংসানীয় কোনো ভূমিকা নয়। কিন্তু এখানে অকৃতকার্যতা আপনি এ জন্যে উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, যেহেতু যেসব লোক আপনার সংগে সংশ্লিষ্ট তারা নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাকিদে আপনার এ ভূমিকাকে বরদাশত করে নিতে বাধ্য হয়েছে। স্বেচ্ছায় কেউ তা করে না, বরং সব সময়ই তারা এ বাধ্যবাধকতা, এ মুরব্বিয়ানা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে সচেষ্ট থাকে। যখনই সুযোগ পায় তখনই এ বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াকে নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করে। লক্ষ্য করলে আপনিও তাদের এ অবস্থা অনুধাবন করতে পারবেন। কিন্তু যে পরিসরে আপনি মানুষকে সংশোধন করতে চাচ্ছেন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের আশা পোষণ করছেন, সেখানে তারা এ কাজে কিছুতেই আপনার কথা শুনতে বাধ্য নয়। আপনি তাদের দ্বারা জোরজবরদস্তি কিছু করাতে চাইলেও বড় জোর এতটুকু হতে পারে যে তারা দৃশ্যতঃ আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে কিন্তু অন্তর তাদের 'ভেতরের মানুষটি'র কথাতেই অটল থাকবে। এ জন্যে তাদেরকে বাধ্য করার মতো কোনো ক্ষমতাই আপনার নেই। সারকথা হলো, এ জাতীয় পরিবেশে কাজ করার জন্যেও আপনাকে সে সব পরামর্শকেই সম্মুখে রেখে অগ্রসর হতে হবে, যা অন্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত হওয়ার জন্যে এ যাবত আলোচিত হয়েছে বা আরো হবে। এক কথায়, এ পরিবেশেও আপনাকে শ্রোতার মনের গতি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে।

হাস্যোজ্জ্বল চেহারা

মহানবী (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা হাসিমুখে যদি নিজের ভাইয়ের প্রতি তাকাও, তাও সাদকায় পরিণত হয়।' হাসিমুখে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার গুরুত্ব

অপরিসীম। কিন্তু অনেকেই এ সম্পর্কে অনবহিত। অনেকেরই এ কথা জানা নেই যে তার ব্যক্তিত্বে কি পরিমাণ শক্তি লুকায়িত আছে এবং তার ঈষৎ হাসির মূল্য যে কি! অপরের হৃদয়ে নিজের আসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, সহাস্যবদনে তার সঙ্গে মিলিত হওয়াই একমাত্র পন্থা। মুখে কথা বলা অপেক্ষা সামান্যতম শুভেচ্ছামূলক হাসিরই প্রভাব অধিক হয়ে থাকে। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা যেন প্রথম সাক্ষাতেই আগত ব্যক্তিকে এই বলে স্বাগত জানায় যে, "আমি তোমায় ভালোবাসি"। আর গম্ভীর এবং কোঁচকানো ভুরু ব্যক্তিকে দেখা মাত্রই আপনি মনে করবেন যে, তার বর্তমান অবস্থা যেন আপনাকে লক্ষ্য করে বলছে, "তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। আমি তোমাকে ভালোবাসি না"। মানুষকে নিজের থেকে দূরে সরানোর জন্যে রুক্ষ এবং কর্কশ ব্যবহারই যথেষ্ট। তবে যার একান্ত ইচ্ছা মানুষের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা, মানুষের মনকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনা, তার হৃদয় জয় করা এবং তার জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ ও চিন্তাধারাকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে আমূল পরিবর্তন করা— এমন ব্যক্তি এটা কিছুতেই পছন্দ করবে না যে তার কোনো অশোভন আচরণের দরুন মানুষ তার থেকে দূরে সরে যাক। এরূপ কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির জন্যে উচিত, সর্বদা হাসিমুখে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং সর্বদা ভদ্রোচিত ব্যবহার করা। মানুষের মন জয় করার জন্যে এটা সত্যিই শ্রেষ্ঠতম উপায়।

সাক্ষাতে কারো সঙ্গে হাসিমুখে মিলিত হওয়া সম্পর্কে উপরে যা কিছু বলা হয়েছে, এর মানে এ নয় যে, স্বার্থোদ্ধারকারীদের ন্যায় কৃত্রিম হাসি দ্বারা সাময়িকভাবে মানুষকে খুশি করতে হবে। এরূপ হাসিকে মানুষ স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ার এবং বিদ্রুপাত্মক বলেই মনে করে, যা কোনো ব্যাপারে ধোকা দেয়ার জন্যেই মানুষ করে থাকে। বরং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাধারণতঃ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতকালে মানুষ যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে হাসিমুখে মিলিত হয়, তেমন অকৃত্রিম হাসি। এরকম স্নেহ-ভালবাসা মিশ্রিত হাসিই অপরের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

যে কোনো প্রকার সফলতা অর্জন করতে হলেই সন্তুষ্টচিত্তে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা আবশ্যক। এমনিতেই মানুষ বহু সময় অযথা হাসিখুশিতে নষ্ট করে। তা না করে এ সময়টাকে এক মহত্তর উদ্দেশ্যে অপরের সঙ্গে হাসিখুশিতে কাটানো যেতে পারে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অতি সহজেই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে কারুর সঙ্গে মোলাকাত করার মধ্যে যে কি যাদু প্রভাব রয়েছে আদর্শের প্রচারকদের জন্যে তা একার পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

এতে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত আনন্দমুখর হয়। সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে এরূপ ব্যবহার হয় যথেষ্ট সহায়ক। এক কথায় অপরের মন জয় করার জন্যে এটা একটা মস্তবড় উপায়।

আর এরূপ করার যদি আপনার অভ্যাস না থাকে, তাহলে আপনি এর অভ্যাস করুন। হয়তো কোনো ব্যাপারে আপনি পীড়া অনুভব করছেন এখন আপনার মধ্যে কেবল বিরক্তি বিরক্তি ভাব, সে ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে আপনাকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা বিরক্তি অনুভব করেই বা লাভ কি এতে তো আপনার মনের অস্থিরতা যাবে না। ব্যস্ততা বা বিরক্তি ভাব প্রকাশে সমস্যার আদৌ সমাধান হবে না। বরং যতই আপনি পীড়া অনুভব করবেন, ততোই আপনার মানসিক ও দৈহিক শক্তি লোপ পেতে থাকবে। ক্রমেই আপনি ধৈর্যশক্তি হারিয়ে ফেলবেন। এটা অবশ্য ঠিক যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম-প্রবাহে তাকে মাঝে মাঝে এমন কিছু অপ্রীতিকর এবং অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, যাতে সে সময় মনের স্বাভাবিকতা রক্ষা করা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে মানুষ যদি প্রথমতঃ ছোট-খাটো অবাঞ্ছিত ব্যাপারে ধৈর্যের পরিচয় দিতে শেখে তাহলে তার জন্যে বিরাট বিরাট কষ্ট ও বেদনাদায়ক ব্যাপারও সহ্য করা সহজ হয়ে ওঠে।

পক্ষান্তরে সাধারণ ব্যাপারে যে ব্যক্তি খিটখিটে মেজাজের পরিচয় দিয়ে থাকে বিরাট কোনো সমস্যা দেখা দিলে তো সে উন্মাদ হয়ে যাওয়ারই কথা। উন্নত চিন্তাধারা এবং উচ্চাকাংখা আপনার মনে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। এতে কোনো সাধারণ বিষয় আপনার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে সক্ষম হবে না। কোনো মহান লক্ষ্যাভিসারী মামুলী ব্যাপারে কোনো দিনই প্রভাবিত হবে না কারণ যেহেতু আপনি ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান এটা আপনার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যা কিছু হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতেই হচ্ছে। আপনি আল্লাহর মেহেরবানীর প্রত্যাশী। সুতরাং এই ভেবে যাবতীয় অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে স্থির ও শান্ত রাখতে সক্ষম-স্পর্শকাতরতা থেকে আপনি মুক্ত। আর এটাই ঠিক যে, সে ব্যক্তিই সুখী যার মন নিরুদ্বেগ এবং শান্ত। অতএব আপনার মত মহান আদর্শের অনুসারী ব্যক্তির মুখেও যদি স্বাভাবিকতার উর্ধে উঠে একটা মহান লক্ষ্যর খাতিরে আনন্দের ভাব প্রকাশিত না হয়, তাহলে এরূপ আশা আর কার থেকে করা যেতে পারে? খোশমেজাজ থাকলে এতে আপনারও কল্যাণ নিহিত আছে। কেননা এটাই একমাত্র সমাদৃত হওয়ার পথ। এছাড়া আপনি কারো কাছেও পৌছতে পারেন না।

চেহারা সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা, মৃদু মৃদু হেসে কথা বলা, হাসিমুখে কারো সঙ্গে আলাপ করা এক কথা, আর অযথা অসম্পৃক্তভাবে হি হি করা অন্য কথা। কিছু সংখ্যক লোক বিশ্রীভাবে হাসি-ঠাট্টা এবং অশোভনীয় ও দায়িত্বহীন আলাপ-আলোচনা করাকে 'হাসিমুখে কথা বলা' মনে করে থাকে। অপরকে ব্যঙ্গ করা, অযথা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা এবং মানুষকে পেরেশান করাই তাদের দৃষ্টিতে হাসিখুশি থাকার পদ্ধতি। কিন্তু এটা ঠিক নয়। এতে আপনি অপরের হৃদয়কে হাতের মুঠোয় আনা তো দূরের কথা, বরং আপনার থেকে আরো বেশি দূরে সরে যাবে।

কথা বলার ধরন

যদি আপনি লোকের ঘৃণা কুড়াতে চান এবং এও চান যে, লোক আপনাকে এড়িয়ে চলুক, তাহলে এর সহজ পদ্ধতি হলো এই যে, অপর কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আপনি অনর্গল বকে যেতে থাকুন অথবা যখনই কেউ কথা বলা আরম্ভ করে, সংগে সংগে আপনিও বলতে শুরু করে দিন এবং সর্বদা চেষ্টায় থাকুন যে, যখনই কথার ফাঁকে সুযোগ মিলবে নিজের বক্তব্য শ্রোতাদেরকে শুনিয়ে দিন। এমন বহু লোক দেখা যায়, যারা সর্বদা অপরের বক্তব্য শোনার চাইতে নিজের বক্তব্য শোনাবার জন্যেই বিশেষভাবে উদগ্রীব হয়ে থাকে। স্মৃতিপটে কোনো কল্পনা উঁকি মারতেই কথার ফাঁকে তা ঝট করে বলে ফেলে-এত শ্রোতার উক্তির প্রতিবাদের স্থলে সমর্থনই বা হয়ে যাক না কেন, এধরনের ভাবপ্রবণদের এসবের প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কাই থাকে না।

যে ব্যক্তি মানুষকে তার প্রতি আসক্ত করতে চায়, তার যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা শ্রোতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার চিন্তাধারার পরিবর্তনের চেষ্টা করে, এরূপ ব্যক্তি বিশেষ করে আদর্শের প্রচারকদের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপরের বক্তব্য শোনার অভ্যাস করা একান্তই জরুরী। শ্রোতাকেও নির্বিঘ্নে প্রাণখোলা আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। শ্রোতার বক্তব্য এবং আলোচনা থেকে আপনি এমন কিছু যুক্তি-তথ্য সংগ্রহ করুন যার সাহায্যে আপনি নিজের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন। শ্রোতার বক্তব্যের বিষয়-বস্তু বা আলোচনা যদি সুদীর্ঘ হয় এবং আনুপূর্বিক সকল কথা স্মরণ রাখা অসম্ভব বলে মনে হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আলোচনার মাঝে মাঝে আপনাকে নিজের যুক্তিগুলো নোট করে নেয়া উচিত।

ধৈর্যসহকারে কারো বক্তব্য শ্রবণই কেবল যথেষ্ট নয়, তার জওয়াব দানকালেও আদর্শের প্রচারকদের জন্যে যথেষ্ট সংযম-সতর্কতা এবং ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। ধরুন, আপনি কারো কোনো মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। এতে অবশ্য তেমন বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন নেই। যেভাবেই আপনি সমর্থন জানান না কেন, তাতে মাপ-জোপ করে কথা না বললেও তেমন বিশেষ কিছু আসে যায় না; কিন্তু বিরাট সমস্যার ব্যাপার হবে তখন, যখন আপনি কারো উক্তির প্রতিবাদ করতে যাবেন। এ ক্ষেত্রে আপনাকে পূর্ণ হুশিয়ারীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। সাধারণত ঃ প্রতিপক্ষের কোনো উক্তির প্রতিবাদে বলা হয়ে থাকে-(১) "এ সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান নেই। (২) আপনি বিষয়টি বুঝেননি (৩) আপনি যা বলছেন সম্পূর্ণ অবাস্তব (৪) এ জাতীয় কথাবার্তা দ্বারা বিভেদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি আপনার উদ্দেশ্যে" ইত্যাদি। এ ধরনের যে কোনো বাক্য ব্যবহারেই শ্রোতা বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা কোনো মানুষই নিজেকে অজ্ঞ, মূর্খ, স্বল্পজ্ঞানী, অসাধু অথবা মিথ্যাবাদী বলে মেনে নিতে রাজি নয়। অথচ যে প্রকারেই হোক আদর্শ প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণকারী হিসেবে আপনাকে তার চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন করতেই হবে, তার চিন্তার গতি আর একটি বিশেষ দিকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে তার ওপর আপনার প্রভাব বিস্তার করা একান্ত জরুরী; এমন ক্ষেত্রেই আপনাকে পূর্ণ সতর্কতার সংগে কথা বলতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— ধরুন, আপনি এক ব্যক্তির কাছে নিজের দাওয়াত পৌছাতে গিয়েছেন। আপনার দাওয়াত শোনার পর প্রশ্ন করে বসলো যে,- "আপনি আমাকে যে আদর্শের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, তা সত্যিই মহৎ কিন্তু এ যুগে কি এটা গ্রহণযোগ্য?" এ জাতীয় প্রশ্ন শোনার পর এমন বহু লোক আছে যারা মনে করবে যে, প্রশ্নকারীর ঈমান-আকীদায় নিশ্চয়ই ত্রুটি রয়েছে, এ কারণেই তার মুখ দিয়ে এরূপ কথা বের হয়েছে। অথবা প্রশ্নকারী সম্পর্কে বলা হবে-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মোটেই জ্ঞান নেই। আরো পড়াশুনা করা আবশ্যক বা তাকে বলা হবে যে কিছুই বুঝে না; তার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। প্রশ্নকারীর উক্তির জবাবে উপরোক্ত মন্তব্যসমূহ তাকে আপনার নিকটে আনার পরিবর্তে আপনার থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আপনি তাকে বে-ঈমান বলুন বা তার ঈমানের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করুন, অথবা তার অজ্ঞতার দিকেই তার পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করুন না কেন, প্রত্যেকটা অবস্থায়ই তার ভেতরের 'মানুষ'টি এ ধরনের উক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং এ অবস্থায় আপনি তাকে কিছুই বুঝাতে সমর্থ হবেন না। মানুষ মাত্রই নিজের ধারণা-বিশ্বাস, মত-পথ এবং সিদ্ধান্তকে নির্ভুল মনে করে। যদিও এতে অহরহ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

বিশ্বাসের পরিবর্তন হচ্ছে, সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম ঘটছে। চিন্তার ধারা বদলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন, কোনো ব্যক্তির চরিত্রে স্বাভাবিকভাবে কিংবা তার ইচ্ছায় এরূপ পরিবর্তন ঘটলে তার কোন রূপ আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু যখনই অপর কর্তৃক এ পরিবর্তনের চেষ্টা চলে তখন তার মধ্যে জিদ ও গোঁড়ামীর সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে কথা বলার সময় আপনাকে এমন ভূমিকা গ্রহণে অভ্যস্ত হতে হবে, যাতে ঐ ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করতে বাধ্য হয়। তার সম্মুখে প্রতিবাদের সুরে নয়, বরং সে চিন্তা করার জন্যে আলোচনার অপর একটা দিক তুলে ধরতে হবে। তার যে মতটির সপক্ষে সে ভুল প্রমাণ উত্থাপন করেছে, তার সরাসরি বিরোধিতা না করে বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়টির ওপর এমন একটা সূত্র ধরে আলোচনা চালাতে হবে, যার ফলে এতেই তার দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং তার চিন্তার যাবতীয় গলদ ধরা পড়ে। অবশ্য সময়, পরিবেশ এবং ব্যক্তি হিসেবে আপনার এ ভূমিকা বিভিন্নরূপ হবে। আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে মনোযোগ এবং সামান্য অনুশীলনের পর অল্পদিনের মধ্যে আপনার সম্মুখে এমন আরো বহুবিধ পন্থার উদ্ভব হবে। যেমন মনে করুন, আপনি প্রশ্নকর্তা বা অনুরূপ মন্তব্যকারীকে বললেন, "আপনার মতের সমর্থনে আপনি যে সকল যুক্তি-প্রমাণাদি পেশ করেছেন, এগুলো অবশ্য ঠিকই, কিন্তু এ ব্যাপারটি আপনি অমুক দৃষ্টিকোণ থেকে একবার বিচার করুন তো তাতে হয়তো অপর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।" এ ধরনের বহুবিধ পন্থা রয়েছে যা ব্যক্তি এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনি নিজের থেকে বের করতে পারেন। এতে প্রশ্নকারী আরো বহু বিষয়ের ওপর তার চিন্তাকে আরো সম্প্রসারিত করতে পারে।

আপনি একটা বিষয় বুঝে নিয়েছেন। তার সমর্থনে আপনার নিকট যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণও আছে। আপনি যেসব যুক্তি-প্রমাণকে এতই সুষ্ঠু এবং নির্ভরযোগ্য মনে করেন যে, আপনি চান সকলেই তা মেনে নিক। এ জন্যে আপনার শ্রোতার ব্যাপারেও আপনি মনে করেন যে, তার যুক্তি খণ্ডনের ব্যাপারে এসব প্রমাণাদির পুনরালোচনাই যথেষ্ট। কিন্তু এ প্রচেষ্টা কিন্তু এ ব্যাপারে হয়তো আপনার অভিজ্ঞতা আছে যে, অনেক ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় না। কেননা আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন, আপনার শ্রোতার যুক্তির পেছনেও কিছু সত্যতা থাকে। তার চিন্তার বিভ্রাটের পেছনেও কিছু বাস্তব কারণ রয়েছে। তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দেরও এতে স্থান রয়েছে, তাছাড়া পরিবেশের প্রভাবও তার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ হলো,

শ্রোতার চিন্তা-বিভ্রাটের সত্যিকার সূত্র খুঁজে বের করা এবং তা উপলব্ধি করা। প্রতিবাদ করতে হলে সমবেদনার সুরে করা। এক কথায় আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় আপনার পূর্ণাঙ্গ কামিয়াবী হলো এই যে, আপনার শ্রোতা যেন আপনাকে বিরোধী পক্ষ বলে ধারণা না করে, বরং সে যেন মনে করে আপনি তারই একজন শুভাকাঙ্খী বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। শ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গী কি, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তার যুক্তিগুলো বুঝবার জন্যে প্রয়োজনবোধে একাধিকবার সেগুলোর পুনরাবৃত্তিও করতে পারেন, যাতে সে মনে করে যে, সত্যি আপনি তার কথাগুলোর প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন এবং তার প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করছেন। সুতরাং এর পরই আপনি আশা করতে পারেন যে, এখনই তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তারের উপযুক্ত সময়।

আর একটা বিষয়ের প্রতিও আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তা হচ্ছে আলোচনাকালে শ্রোতাকে যেন আপনি কথা প্রসঙ্গে এমন কোন প্রশ্ন না করে বসেন যাতে সে বিরক্তিবোধ করতে পারে। যেমন-আপনি তার আলোচনা থেকে অনুমান করতে পারলেন যে, সে আপনার সংগঠনের অমুক বইটি পাঠ না করার দরুন এ ধরনের ওলট-পালট কথাবার্তা বলছে। তবুও আপনি যদি তাকে প্রশ্ন করে বসেন যে, 'জনাব, আপনি কি অমুক বইটি পাঠ করেছেন?' পাঠ না করার স্বীকৃতি তার জ্ঞান পরিসরের সংকীর্ণতার প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিতস্বরূপ। তাকে সর্বদা এ ধরনের প্রশ্নই করতে হবে যার উত্তরদানে সে লজ্জিত না হয়ে বরং আনন্দানুভবই করবে। কেননা এটা বাস্তব সত্য যে, কোনো প্রশ্নের নির্ভুল ও অকাট্য জবাবদানে মানুষ গর্ব অনুভব করে এবং এটা তার বেশ ভালোও লাগে। তাই এ ধরনের প্রশ্ন করে আপনি তার মনের আনন্দের সঞ্চার করতে পারেন।

একথাও ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব সমস্যাকে দুনিয়ার সকল সমস্যার উর্ধে স্থান দিয়ে থাকে। ধরুন, কারো ভীষণ মাথা ব্যথা হচ্ছে। ঐ সময় তার কাছে এটা এমনই জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে, সে সময় যদি রাশিয়ায় প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ হতে থাকে বা দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে থাকে— এ সংবাদ তখন তার মনে আদৌ কোনো রেখাপাত করবে না। অনুরূপভাবে কারো ছেলে যদি চরিত্রহীন হয়ে যায়, ভুলপথে পরিচালিত হয়, তখন এটাই তার একমাত্র মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, সে সময় সারা দেশ চরম নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের শিকারে পরিণত হোক না কেন, এর প্রতি সে নজর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না। অতএব আপনার দায়িত্ব হবে কারো চিন্তাজগতে পরিবর্তন সাধন করতে হলে

তার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হওয়া এবং তার আশেপাশের পরিবেশটা একবার ভালোভাবে দেখে নেয়া। তাতে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন কোনো জিনিস রয়েছে যা ঐ ব্যক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করেই আপনি তার সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। যেমন মনে করুন, আপনি তাকে বুঝাচ্ছেন— মানুষের রচিত বিধান মানুষের কল্যাণার্থে কিছুতেই কার্যকরী নয় এবং এ দ্বারা কিছুতেই মানব-সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এ উদ্দেশ্যে আপনি এর সমর্থনে দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনা এবং যুক্তি-প্রমাণাদির অবতারণা করলেন। কিন্তু এটা তার কাছে তত আবেদনশীল হবে না, যতটা আবেদনশীল হবে যখন উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে আপনি তার সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তার সপক্ষে যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করবেন। প্রায় সকল ব্যাপারেই এরকম অবস্থা দেখা যায়। সে সময় ভালোভাবে পরিস্থিতি অনুধাবন করা উচিত।

অনেক লোক সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কথা বলে নিজের কথার গুরুত্ব হ্রাস করে ফেলে। কোনো সময় হয়তো কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছে অথবা অন্য একটা কাজের প্রতি তার সম্পূর্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট রয়েছে, এমতাবস্থায় যদি আপনি নিজের কথা নিয়ে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হন, তাহলে এটা জানা কথা যে, আপনাকে তখন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে। আপনি যদি কৃতকার্য হতে চান, তাহলে আপনাকে উপযুক্ত সময়ে তার সংগে মিলতে হবে, যাতে সে আগ্রহ সহকারে আপনার কথাবার্তার প্রতি মনোযোগী হয়, আর না হয় উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় থাকতে পারেন। প্রত্যেকেরই এমন কোনো না কোনো বিষয় রয়েছে, যার প্রতি তার আকর্ষণ সবচাইতে বেশী। আপনি উক্ত বিষয় নিশ্চয়ই নিজের আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। যেমন শিকার করা বা কবিতা আবৃত্তির শখ কিংবা কোনো পেশা অথবা শিল্পের প্রতি ঝোঁক কিংবা কোনো আন্দোলনের সংগে জড়িত হওয়া, চাষ করা, ফুলের বাগান করা, বাড়িঘর তৈরি করা বা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার ইত্যাদি— এ জাতীয় এমন অসংখ্য বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন। এইভাবে আপনার আদর্শ প্রচারের জন্যে ময়দান প্রস্তুত করতে পারেন। এ ছাড়া অন্য পন্থায় সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি আপনার কথা নীরবে শ্রবণ করলেও তা নিছক ভদ্রতার খাতিরেই হয়তো কতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনতে থাকবে, কিন্তু তার পরক্ষণেই কথা কাটাকাটি আরম্ভ করে দেবে। কাজেই আদর্শ প্রচারের

ক্ষেত্রে সত্যিকার সফলতা লাভ করতে হলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে নিজের জন্যে স্থান করে নিতে হবে।

গুণের সমাদর

একটা মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া আপনার উদ্দেশ্য। আপনি চান সমাজের মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন করতে। আপনি চান, মানুষের মন-মগজ থেকে তাদের বহুদিনের সযতনে লালিত বহু চিন্তাধারাকে বহিষ্কার করতে, তাদের আদরের প্রবৃত্তিসমূহ থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনতে। নিঃসন্দেহে এটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে যেহেতু দুনিয়ার অপরাপর জটিল থেকে জটিলতার বিষয় যেমন সুষ্ঠু কর্মনীতির ফলে সহজ হয়ে দাঁড়ায়, এ কাজেও অনুরূপ পন্থায় জটিলতা দূরীকরণ তেমন অসম্ভব কিছু নয়। বরং সুষ্ঠু ও যথোচিত মার্জিত পন্থায় করতে পারলে এ কাজও মনোমুগ্ধকর হতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরামর্শ পেশ করছি। যেমন ধরুন, আপনি এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাশালী। সামান্য মনোযোগেই আপনার কথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি বিরাট কারবারে সদা ব্যস্ত থাকায় তার এতটুকু ফুরসৎও নেই যে, একান্তে বসে আপনার দুটো কথা শুনতে পারে। এছাড়াও বড় বড় শহরে তো প্রায় সকলের একই অবস্থা। ওখানে কোনো 'বেকুব'কেই পাওয়া যেতে পারে যার কোনো কাজ নেই, নয়তো যার দিকেই লক্ষ্য করবেন দেখবেন সকলেই মেশিনের পার্টের মতো সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। এ ক্ষেত্রে আপনার প্রতি মানুষের মনোযোগ কিভাবে আকৃষ্ট করবেন? কিভাবে আপনি তাদের মধ্যে এ ইচ্ছা এবং প্রেরণা জাগাবেন, যাতে তারা আপনার প্রতি লক্ষ্য দেয়া এবং আপনার সংগে কথা বলতে প্রস্তুত হয়? এ জন্যে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন ঃ

● ধরুন, জনৈক ব্যক্তি ব্যাংকে যাচ্ছে। সেখানে ভীষণ ভীড়। যে অফিসারের সংগে তার প্রয়োজন, কাজের চাপে সে মাথাই ওঠাতে পারছে না। এমতাবস্থায় তার সংগে কথা বলা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে মাথা তুললেও তাকে শুধু ঐ ব্যক্তির সংগে কথা বললেই তো চলবে না, আরো এমন বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারা নিজ নিজ প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তির সংগে আলাপের অপেক্ষায় আছে। এমতাবস্থায়

কথা বললে সকলের সংগে বলতে হবে।

ধরুন, সে ব্যক্তি কোনো প্রকারে আলাপ করার সুযোগ করেই নিয়েছে। সে মনে করেছে আমি সাহেবের এমন একটা বিষয়ে প্রশংসা করবো যাতে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে যান। এটা মনে করে সে সাহেবের 'টাই'-এর প্রতি লক্ষ্য করলো, এবং একটু সামনের দিকে এগিয়ে বললো, কাজের চাপে আপনার দেখছি কথা বলার একটুও অবসর নেই, নয়তো আপনার এ চমৎকার 'টাই'টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম, এটা কোত্থেকে কিনেছেন? সাহেব মাথা তুললেন এবং মুচকি হেসে বললেন, সত্যি এটা কি আপনারও ভালো লাগছে? "লাগবে না কেন, ভালো জিনিসকে সবাই ভালো মনে করবে এবং প্রশংসার করতে বাধ্য" লোকটি জবাব দিলো। সাহেব তার টাই-এর মাথায় হাত রেখে বললেন, হাঁ তাইতো, এ যাবত আরো কয়েকজনও এটার বেশ প্রশংসা করেছেন।

ব্যাস, এই সামান্য আলাপেই সাহেবকে সে ব্যক্তির দিকে আকৃষ্ট করলো। লক্ষ্য করুন, এ সাধারণ কয়েকটা কথায়ই সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। সে আনন্দও মামুলি ধরনের নয়। এ জন্যে কয়েক ঘন্টা যাবত হয়তো তাকে বেশ প্রফুল্ল বলে মনে হচ্ছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ দু'চার কথাতেই কি করে একটা মানুষের সংগে স্বল্পকালীন সময়ে হৃদ্যতা গড়ে তোলা সহজ। এমনিভাবে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের মূল্য যে কি, তা 'আদর্শ' প্রচারকের জন্যে একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

● জনৈক ব্যক্তির প্রতিবেশী একজন জ্ঞানবান শিক্ষিত যুবক। টেলিফোন অফিসে তিনি কাজ করেন। তাকে প্রায়ই কর্মব্যস্ত দেখা যায়। তার সঙ্গে কথা বলার কোনো সময়ই পাওয়া যায় না। হয়তো ডিউটিতে থাকেন, নয়তো বেড়াতে বা বাজার করতে চলে যান। এমতাবস্থায় তার সঙ্গে কথা বলার সময়ই বা কোথায়? ঘটনাক্রমে ঐ প্রতিবেশীটি একদিন টেলিফোন একচেঞ্জ অফিসে গিয়েছে। ঐ সময় কিন্তু উক্ত ভদ্রলোকেরই ডিউটি। দুই কানে তার যন্ত্র লাগানো। একের পর এক দিক তিনি অনর্গল নম্বর বলেই যাচ্ছেন আর ওদিকে এক থেকে অপর দিকে নম্বর মিলিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কাজের অতো চাপের পরও তার মধ্যে বিরক্তির লেশ মাত্রও দেখা যাচ্ছে না। নরম এবং মিষ্টিস্বরে নম্বর বলে যাচ্ছেন। ভাষায় কোনরূপ কর্কশ এবং রুক্ষতার নাম গন্ধও নেই ভদ্রলোকের। উক্ত ব্যক্তি দীর্ঘক্ষণ যাবত তা প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে। যখনই একটু ফাঁক পেল তখন এমুহূর্তকে সে উপযুক্ত সময় মনে করে আন্তরিকতার সঙ্গে ভদ্রলোকের

স্মৃতিশক্তি এবং তার মিষ্টি ও মোলায়েম জবাবের কিঞ্চিৎ প্রশংসা করলো। এ কিঞ্চিৎ সমাদর দেখে অপরেটর সাহেবের চেহারা আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি সোৎসাহে বলে উঠলেন, আপনি এ কি দেখেছেন, সে সব সময়তো আপনি দেখেনইনি, এর চেয়েও আরো বহুগুণ ঝামেলা যখন বেড়ে যায়। ঐ সময় মাথা চুলকানো নয়, বরং বলতে হবে নিঃশ্বাস ফেলারও সময় থাকে না। অতঃপর অপারেটর সাহেব বললেন, সামান্য অপেক্ষা করুন। আমার ডিউটিও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আর সামান্য বাকী। এক সঙ্গেই বাসায় ফিরবো।

এরপর উভয়ে একসঙ্গে বাসায় চললো এবং পথে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। ফলে এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, যে অপারেটরের সঙ্গে সামান্য আলাপ করার জন্যে ৫টি মিনিটও সময় পাওয়া যেত না, এখন ঘন্টার পর ঘন্টা বসেও সে পুস্তক পাঠ শুনছে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোপ-আলোচনা করছে। এক কথায় এখন তার জীবনের গতিধারাই ভিন্নখাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

● কোনো ব্যক্তি জনৈক প্রফেসারের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ খুঁজছিলো, কিন্তু ভদ্রলোক নিজেকে এতই সামলিয়ে চলেন যে, কারো সালামের জওয়াব দানের পর তার সঙ্গে অধিক কথা বলার সুযোগই তিনি কাউকে দিতেন না। হঠাৎ একদিক জানা গেলো, প্রফেসার সাহেব অসুস্থ। আজকে কলেজেও যেতে পারেননি। সে ব্যক্তি সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে গেলেন। বাসায় সংবাদ পাঠিয়ে জানতে পারলেন, পফেসার সাহবে তার পড়ার ঘরে আরাম করছেন এবং তাকে সেখানে যেতে বলেছেন। অত্যন্ত নিপুণভাবে বই-পুস্তক পড়ার টেবিল এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র তার কক্ষে সজ্জিত ছিল। সুযোগ পেয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদের পর সে ব্যক্তি প্রফেসার সাহেবকে বললোঃ
আপনার কামরায় সুবিন্যস্তভাবে রক্ষিত জিনিসপত্র সত্যিই আপনার মার্জিত রুচির পরিচায়ক। বড়ো চমৎকার! বেশ সুন্দরভাবেই আপনি কামরাটিকে বই-পুস্তক ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়াশুনার জন্যে এমন স্থানই উত্তম। এখানে পড়ার ইচ্ছে না থাকলেও পড়তে পড়তে ইচ্ছে হয়। এমন প্রশংসা শোনার পর প্রফেসার সাহেব ঐদিন কেবল কামরায় আসবাবপত্র সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন আলমিরায় ও শেলফে রক্ষিত পুস্তক-গ্রন্থাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে দেখা গেলো, তারপর থেকে তার মধ্যে এখন আর সে অবজ্ঞার ভাবটুকু নেই, যা

ইতিমধ্যে ছিল। এখন তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা বসেও উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। সে তাকে যে কোনো পুস্তক পড়তে দেন তা তিনি পড়তে থাকেন আর ক্রমে ক্রমে বইয়ের বিষয়বস্তু তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

উপরোক্ত কথাগুলো যদিও দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা হলো, কিন্তু এর বুনিয়াদ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে আজকাল বিবেচিত হচ্ছে। এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, এ ধরনের ঘটনাবলীর দরুন মানুষ একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। বরং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ রয়েছে। তা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষেরই বাসনা থাকে, 'মানুষ আমাকে সম্মানের চোখে দেখুক, আমাকে ভাল বিবেচনা করুক।' আপনি এবং আর সবারও মনের একান্ত ইচ্ছে এই যে, মানুষ আপনার সৌন্দর্য, গুণাবলী এবং যোগ্যতার স্বীকৃতি দিক, আপনাকে সম্মান করুক। অবশ্য এখানে সত্যিকার সৌন্দর্য এবং যোগ্যতা বলতে যা বুঝায় তারই কথা বলা হচ্ছে। মুখ দেখে কথা বলার মিথ্যা বা অবাস্তব কিছু প্রশংসা করা কিংবা কৃত্রিম তোষামোদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, যে জন্যে শ্রোতার মনে অহংকারের ভাব সৃষ্টি হতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কি কি যথার্থ গুণাবলী এবং যোগ্যতা রয়েছে তা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনার প্রতিটি কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটা প্রকাশ হওয়া চাই। আপনি তার যোগ্যতাকে সঠিক মর্যাদা দিচ্ছেন। দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষ নেই যার মধ্যে অল্পবিস্তর কিছু গুণাবলীর সূত্র ধরে তাদের অসংখ্য দোষ-ত্রুটি সংশোধনের পথ বের করা যায় না। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করাটা সহজ কাজ। এটা অন্যের জন্যে ছেড়ে দিন। মানুষের সদগুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলুন। তারপর দেখতে পাবেন কিভাবে মানুষ আপনার ডাকে সাড়া দেয় এবং আপনার প্রতি তাদের আকর্ষণ বেড়ে যায়।

জয়-পরাজয়ের ভাব

একটা মহান উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করা আপনার লক্ষ্য। আপনি চাচ্ছেন অন্যান্য মানুষও আপনার আদর্শের অনুসারী হোক। আপনার কথা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করুক। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে আরো কিছু পরামর্শ রাখা হচ্ছে। এগুলোর প্রতিও আপনার লক্ষ্য করা উচিত।

একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। একদিন জনৈক আলেমের সঙ্গে আমি এক দাওয়াতে গিয়েছিলাম। যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় রত। এমন সময় আমি লক্ষ্য করলাম, এক পাশে জনৈক ভদ্রলোক কথার মাধ্যমে বেশ বাগ্মিতা দেখাচ্ছে। তার বর্ণনা-ভঙ্গীতে. মনে হচ্ছিল সে যেন তার বিদ্যার বহর দেখিয়ে সবার ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। একবার কথা প্রসঙ্গে বললো, কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন "আল-আ'মালু বিন্নিয়্যাত"-(কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল) আমি এবার ভালোভাবে ঐদিকে কান পেতে তার কথাগুলো লক্ষ্য করতে লাগলাম। প্রথমতঃ আমি যে বুজুর্গের সঙ্গে দাওয়াতে গিয়েছেলাম, তার প্রতি একবার তাকালাম। উদ্দেশ্য, দেখি তিনি ঐ ব্যক্তির এ উদ্ধৃতির কোনো প্রতিবাদ করেন কিনা। কিন্তু যখন দেখা গেল যে তিনি এ ভুলের কোনোই প্রতিবাদ করলেন না, তখন আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। ইনি হয়তো আঁচ করতে পেরেছেন যে,তার ভুলটি কোন্ জায়গায়। আমার মতো একজন সামান্য পড়ুয়া লোক একথা জানে যে, "আল আ'মালু বিন্নিয়্যাত" এটা কুরআনের আয়াত নয়। কেননা কুরআনের কোথাও এ বাক্যটি নেই। বরং এটা একটা বিখ্যাত হাদীস যা প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিপিবদ্ধ থাকে। কত মস্ত বড় ভুল! যদি প্রকাশ্যভাবে তার এ ভুল নির্দেশ করা হতো, নিশ্চয় সে সকলের সামনে অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে যেতো এবং নিজেকে সবজান্তা বলে প্রামাণ করার যে চেষ্টা করছিল, তা ফেসে যেতো। কিন্তু আমি দেখলাম, আমার সঙ্গী শ্রদ্ধেয় আলেম সাহেব এ সম্পর্কে কিছু বলছেন না। ঐ ব্যক্তি তার মনগড়া কথায় একাধারে যা ইচ্ছে বলেই যাচ্ছে। একেকবার আমরার ইচ্ছে হচ্ছিল যে, তার মাতব্বরীর ঘটিটা ভেঙ্গে দেই; কিন্তু আমি কি করবো না করবো চিন্তা করতে করতেই সে অন্য প্রসংগে চলে গেছে। কথা পুরোনো হয়ে গেছে ভেবে নীরব থাকলাম। দাওয়াত থেকে ফেরার পথে আমি আলেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলামঃ “আচ্ছা লোকটি অতো বড় ভুল করা সত্ত্বেও আপনি কিছু বললেন না কেন? যে ব্যক্তি আল-আ'মালু বিন্নিয়্যাত”কে কুরআনের আয়াত বলে উল্লেখ করে, তার যে এলেমের দৌড় কি পরিমাণ তা তো পরিষ্কারই বুঝা যায়।” মাওলানা সাহেব তখন আমাকে বললেন, সে সময় তাকে লজ্জা দেয়াটা আমি পছন্দ করলাম না। কেননা এমতাবস্থায় সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আমার থেকে দূরেই সরে যেতো। তাছাড়া এটাও চিন্তা করার বিষয়, সে তো আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করেনি যে, “আল-আ'মালু বিন্নিয়্যাত” কি কুরআনের আয়াত, না হাদীসের অংশ?”

আমার সে বন্ধু মাওলানা সাহেব আজ ইহজগতে নেই। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন। কিন্তু তার কথা এখনও আমার হৃদয়ে অংকিত হয়ে আছে। অনেকেরই এ জাতীয় উপদেশাবলীর প্রয়োজন রয়েছে, যা সে বুজুর্গ ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যে, মানুষ সর্বদা অপরের সঙ্গে কথায় কথায় জড়িত হয়ে পড়ে। অপরের সঙ্গে বিতর্কে জড়িত হওয়ার প্রবণতা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষই সুযোগ পেলেই অপরের সমালোচনা করে তৃপ্তি পায়। তক-বিতর্কের জোরে সবাই সুমতের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু আপনি যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তর্কে জয়ী হওয়ার জন্যে একটা মাত্র পথই সর্বোত্তম, আর তা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে তর্ক করা থেকে দূরে অবস্থান করা। যেমন মানুষ অনিষ্টকর জন্তু-জানোয়ার এবং সাপ-বিচ্ছু থেকে দূরে অবস্থান করে। নিরানব্বই ভাগ তর্ক-বিতর্কের ফলাফলই এমন দেখা গেছে যে, এতো কিছু বিতর্কের পরও উভয় পক্ষ মনে করে যে, তাদের নিজেদের যুক্তিই ঠিক এবং নির্ভুল। আপনি কোনদিনই তর্কে জয়ী হতে পারবেন না। পরাজয় বরণ করলে তো করলেনই আর জয়ী হলেও দেখতে পাবেন আপনি পরাজিত। কেননা এ অবস্থায় আপনি তো এটাই প্রমাণ করেছেন যে, আপনার প্রতিপক্ষ অজ্ঞ। কেননা এ অবস্থায় আপনি তো এটাই প্রমাণ করেছেন যে, আপনার প্রতিপক্ষ অজ্ঞ। এতে আপনি কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দিত হয়েছেন বটে, কিন্তু তর্কে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আপনি তাকে খাটো এবং হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তার স্বাবলম্বিতা এবং ব্যক্তিত্বে আপনি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। তাকে ব্যথিত করেছেন। তাকে আপনি বাধ্য করেছেন তার মর্জিবিরোধী বিষয় মানার জন্যে। এতে তার মতের আদৌ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তার বদ্ধমূল ধারণা বিন্দুমাত্রও বদল হয়নি। আজীবন লালিত-পোষিত কারো বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্তন তর্ক-বিতর্কে জয়ী হওয়ার মাধ্যমে আদৌ সম্ভব নয়। এতে কোনদিনই মানুষের মতের পরিবর্তন হতে পারে না। বড়জোর প্রতিপক্ষ সাময়িকভাবে আপনার কথা স্বীকার করে নিতে পারে, কিন্তু তা একমাত্র দায়ে ঠেকে-তর্কের মারপ্যাঁচে পড়ে। এমন কি তর্ক-বিতর্কে আপনি কোনো নিরক্ষর অশিক্ষিত ব্যক্তিকেও প্রভাবিত করতে পারবেন না। অবশ্য তাকে আপনি লা-জওয়াব করতে পারবেন। অশিক্ষিতের কথা দূরে থাকুক, অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেলায়ও দেখা যায়— আপনি তার সম্মুখে এমন স্পষ্ট যুক্তি প্রমাণাদি উত্থাপন করেছেন, যা বিনা দ্বিধায় তার মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু তবুও সে তা মানছে না, বরং উল্টো পাল্টাভাবে সে এমন বিতর্ক জুড়ে

দেয়, যাতে শেষ পর্যন্ত বিতর্ক অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যায়। আলোচ্য বিষয় থেকে আলোচনা বহুদূরে সরে যায়। ফলে বক্তারও আর নীতি ঠিক থাকে না যে, সে কি করবে। আর শ্রোতা তো শুধু নিজের কথাই বলে যায় এবং বিষয়বস্তু থেকে নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। নিজেকে এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে দেয়া কিছুতেই আপনার জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা এ জাতীয় অবস্থা আপনার মহান লক্ষ্যে পৌছার পথে মস্তবড় প্রতিবন্ধক ও ক্ষতিকর। তবে ঘটনাক্রমে কোথাও এমন অবস্থার যদি সম্মুখীন হয়েই যান, সে সময় তার থেকে গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। সামান্য বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করলেই এমন পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে পারেন।

নিম্নের একটি দৃষ্টান্ত দেখুন

জনৈক ব্যবসায়ী ব্যক্তির সঙ্গে কোনো ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। অফিসার সাহেব এমন একটা বিষয়ের ওপর ট্যাক্স ধার্য করতে চাচ্ছেন, আইনের বিধান মতে যেখানে ট্যাক্স ধার্যের কোনো অবকাশই নেই। ব্যবসায়ী ব্যক্তি বহু চেষ্টা করে দেখলেন যে, ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসারকে কোনোক্রমে বুঝাতে সক্ষম হচ্ছেন না, বরং যতই তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়, তত বেশী তিনি বাদানুবাদ শুরু করে দেন এবং ক্ষেপে ওঠেন। ঝগড়া বাড়তেই থাকলো। ব্যবসায়ী বুঝতে পারলেন যে, বিষয়টা শেষ পর্যন্ত একটা বাদানুবাদ এবং বিতর্কে পরিণত হচ্ছে। তিনি তখন ঝট করে অন্যদিকে কথার মোড় পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। বললেন, দেখুন অফিসার সাহেব, আপনারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন তার তুলনায় এ বিষয়টি তো কিছুই নয়। এটা সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। এ নিয়ে অতো বাড়াবাড়িটা উচিত হচ্ছে না। আইন-কানুনের ব্যাপারে আপনাদের যে দক্ষতা আছে আমার সেটা নেই, হতেও পারে না। কেননা আমরা তো শুধু বই-ই পড়েছি আর আপনারা নিজেরাই এ নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা পর্যন্ত চর্চা করছেন। বইএর জ্ঞান আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আকাশ-পাতাল তফাত। আইন-কানুন বুঝার ব্যাপারে আমারও যদি এমন সুযোগ ঘটতো, তাহলে হয়তো আমিও ঐ ধারাটির অর্থ তেমনই বুঝতাম, যেমন আপনি বুঝেছেন। যা হোক এখন কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে আমাকেও চিন্তা করতে দিন এবং আপনিও বিষয়টা আরো একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। হয়তো আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে এমন কোনো পথ খুলে যেতে পারে যাতে

আমাকেও সন্তুষ্ট করতে আপনি সক্ষম হবে। এখন এ ব্যাপারে আর অধিক আলোচনা না করে অন্য সময় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেই আমার মনে হয় সবচাইতে ভাল হয়। ব্যবসায়ীর এ কথার অফিসার সাহেব এখন কিছুটা নরম হলেন। আলোচনার গতিও অন্য দিকে মোড় নেয়। অফিসার সাহেব এখন নিজের যোগ্যতার বাহার দেখানোর জন্যে এমন কতিপয় ব্যক্তি কথা উল্লেখ করতে লাগলেন সাধারণতঃ যারা তাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং তিনি তাদেরকে ধরতে পেরেছেন।

এভাবে আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে উভয়ে মধ্যে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ চলতে লাগলো। ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি চলে যেতে উদ্যত হলে, অফিসার সাহেব তার সঙ্গে অঙ্গীকার করলেন আচ্ছা আমি আপনার বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করে দেখবো। তিন দিন পর যখন আবার কারবারী ব্যক্তি ঐ অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাত করলো, তখন বিনা বাক্য ব্যয়ে অফিসার সে কথাই মানতে রাজী হলেন যা ঐদিন বহু তর্কবিতর্কের পরও তিনি মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তার একমাত্র কারণ ছিল যে, সে একজন সরকারী অফিসার হয়ে সাধারণ ব্যবসায়ীর নিকট তার অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তার কাছে নতি স্বীকার করবেন। কেননা এতে প্রমাণিত হবে যে, সংশ্লিষ্ট অফিসার অপেক্ষা একজন ব্যবসায়ী আইনের তাৎপর্য ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এ জন্যেই তিনি নিজের মর্যাদা বহাল এবং দুর্বলতাকে ঢেকে রাখা জন্যে প্রস্তুত হয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং কোনো অবস্থাতেই ব্যবসায়ীর কথা সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু যখনই অন্যভাবে তার মর্যাদার স্বীকৃতি পেলো এবং দুর্বলতা ঢাকা পড়লো, তখনই তার যাবতীয় রোষানল ক্ষণিকের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো এবং তার মন ন্যায় ও সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত হলো। অনুরূপভাবে এমন বহু শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাত ঘটবে। আপনি যদি তাদের সম্মুখে কোনো নির্ভুল যুক্তিও পেশ করেন কিন্তু তারা এ সত্যকে স্বীকার করে আপনার নিকট নতি স্বীকার করতে রাজি হবে না, রাজি হবে না নিজেকে কম জ্ঞানী বলে স্বীকার করতে। পক্ষান্তরে আপনি যদি এমন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন করেন, যাতে তার জ্ঞানানুভূতি আহত না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি তাকে নিজের যুক্তি মানতে বাধ্য করতে পারবেন। বিশেষভাবে আর একটা কথা আপনি স্মরণ রাখবেন, আপনি সর্বদা আলেম, ধর্মীয় নেতা, গ্রাহক, স্বামী-স্ত্রী এদের কাছে তর্কে পরাজয় বরণ করতে চেষ্টা করবেন। কেননা এ ময়দানে আপনার জয়ী হওয়া অপেক্ষা পরাজয় বরণ করাতেই লাভ অধিক। মনে রাখবেন, দুনিয়ায় যারা গঠনমূলক কিছু কীর্তি

রেখে যেতে চায়, সাধারণ কথা নিয়ে তাদের ঝগড়া করার সময়টাই বা কোথায়? ছুটন্ত ঘোড়াকে পথ ছেড়ে দেয়াই উত্তম। অন্যথায় রাস্তা বন্ধ করে দিলে নিজের গায়ে চোট লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। এক কথায় বিতর্কে জয়ী হওয়ার ইচ্ছা করার পরিবর্তে ওখান থেকে দূরে থাকাই ভালো।

মানসিক প্রবণতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

এ বিষয়ে হয়তো আপনার অভিজ্ঞতা আছে যে, আমাদের বহু সিদ্ধান্ত অনেক সময় নির্ভুল প্রমাণিত হয় না। কিন্তু তবুও আমরা এটাকে নির্ভুল মনে করি এবং সহজে অপরের নিকট নিজের ভুল সিদ্ধাদন্তের স্বীকৃতি দিতে চাই না। ঠিক তেমনিভাবে এটা অপরের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। সকলেরই ঐ একই অবস্থা। কারুর মধ্যেই প্রথমতঃ নিজের ভুল স্বীকার করার মতো আত্মবল নেই। তাহলে আপনি বলুন, আপনার কি অধিকার আছে অপরের কোনো ভুল মত এবং সিদ্ধান্তের দরুন তাকে হেয় মনে করার? অথবা এমনিই তার কথাকে উড়িয়ে দেয়ার? আপনার বুঝা উচিত যে, অন্য কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কোন মতকে ভুল বলে, তাহলে একটা আপনার নিকট পীড়াদায়ক এবং বিরক্তিকর ঠেকে, অথচ আপনিই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আপনার কোনো মত বা সিদ্ধান্তও ভুলক্রটির উর্ধ্বে নয়। সুতরাং এ থেকে আমাদের বোঝা উচিত যে, অপরের কোনো মতকেও যদি আমরা ভুল বলি, তাহলে এমনিভাবে তার মনে একটা আঘাত লাগে। এটা মানুষের প্রকৃতি; কেননা এটাকে তার আত্মমর্যাদার প্রতি কটাক্ষ বলে সে মনে করে।

এটাও হয়তো আপনার অজানা নয় যে, কারুর কোনো সিদ্ধান্ত বা মতের বিরোধিতা কেবল মুখের দ্বারাই হয় না, কটুদৃষ্টি, ভ্রুকুঞ্চন, বিদ্রুপাত্মক মুখভঙ্গী, ইঙ্গিত এবং পরোক্ষ কটাক্ষ ইত্যাদির মাধ্যমেও অপরের মতকে ভুল বলে প্রমাণ করা হয়ে থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আর অপরের মতের বিরোধিতা করা এবং একে ভুল প্রতিপন্নের চেস্টা করার মানেই হলো তার মানসিকতার ওপর জেনে-বুঝে হামলা করা। কেননা এর একমাত্র উদ্দেশ্যই তো এই দাঁড়ায় যে, লোকটা কম জ্ঞানসম্পন্ন, ভুল পন্থায় চিন্তা করে ও ভুল পথে পরিচালিত হয়। এতে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই আপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং আপনার ওপর ক্ষেপে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। ঐ সময় তার ভুল পরিষ্কারভাবে তার চোখের সামনে তুলে ধরার জন্যে বা এর সংশোধনের জন্যে

যতো মূলবান যুক্তি প্রমাণই উত্থাপন করুন না কেন, সে কিছুতেই আপনার মতকে সমর্থন করতে প্রস্তুত হবে না।

আদর্শের দাওয়াত পৌঁছানোর সময় উপরোক্ত কথাগুলো স্মরণ রাখা আদর্শের প্রচারকের জন্যে একান্ত কর্তব্য। তাহলে সে কিছুতেই বিরূপ পন্থা গ্রহণ করে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করবে না। অন্যথায় শ্রোতার মনে নিশ্চয় বিরোধিতার ভাব প্রকট হয়ে উঠবে। কারণ প্রত্যেক মানুষের নিকট তার নিজের মত সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে। পরিস্থিতি যখন এরূপই তখন অযথা কেন আপনি নিজের পথে বাধার সৃষ্টি করবেন? মোট কথা প্রচার ক্ষেত্রে এটাই হবে আপনার চরম সাফল্যের প্রতীক-যখন আপনি কারো চিন্তাধারাকে এমন কর্মকুশলতার মাধ্যমে পরিবর্তন করতে সক্ষম হন, যাতে সে একথা উপলব্ধিই করতে না পারে যে, আপনি তাকে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। আপনি অপর অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হোন, জ্ঞানী হবার চেষ্টা করুন কিন্তু তাকে একথা ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে দেবেন না যে, আপনি তার চাইতে জ্ঞানী হতে চলেছেন।

প্রায়ই এমন হবে যে, অপরের ভুল আপনার সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়বে, সে সময় প্রথমতঃ আপনি কিছুতেই শ্রোতাকে একথা জানার সুযোগ দেবেন না যে, আপনার নিকট তার অমুক ভুলটি ধরা পড়েছে বা সে যে মত পোষণ করছে কিংবা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা ভুল। বরং সে ক্ষেত্রে আপনি তাকে বলতে পারেন- "হয়তো এ ব্যাপারে আমি যা বুঝেছি তা ভুলও হতে পারে এবং আপনার মতই ঠিক। তবে পরে আমাদের এটি পুনর্বিবেচনা করায় ক্ষতি কি?" অথবা আপনি এও বলতে পারেন, "আমার অধিকাংশ সময় ভুল হয়ে যায়। আশা করি নিশ্চয় আপনি আমার ভুল সংশোধন করে দেবেন। আসুন, আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আরো চিন্তা করি।" এভাবে অন্য ধরনের অন্য শব্দের দ্বারাও তা করা যেতে পারে। এসব শব্দ একরকম যাদুমন্ত্রের ন্যায়। এ দ্বারা আপনার কোনো জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এতে যাবতীয় বিতর্কের পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি দেখতে পাবেন আপনার শ্রোতাকে একজন যুক্তিবাদী জ্ঞানীরূপে। ঐ সময় সে মুক্তমনে আপনার কথাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করবে এবং এ নিয়ে চিন্তাও করবে।

এমন লোকের সংখ্যা অবশ্য নেহাত নগণ্য যারা কোনো ব্যাপারে যুক্তিপ্রমাণাদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা কোনো বিষয়ক যৌক্তিকতার আলোকেই বিশেষভাবে বুঝতে চেষ্টা করে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যেও এই

প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা যুক্তির কোনো ধারই ধারে না। বরং যেভাবেই হোক অপরের ওপর তার কথা চাপিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকে। কেবল তাই নয়, এ ধরনের লোকের মধ্যে আরো বহুবিধ ব্যাধি প্রত্যক্ষ করা যায়। হতে পারে আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আপনাকে সন্দেহ করে, কোনো কারণে আপনাকে ভয় করে অথবা আত্মম্ভরিতায় তার মন পরিপূর্ণ এবং আপনাকে হিংসা করে। এক কথায় মানুষের মধ্যে এমনি ধরনের অসংখ্য রোগ বিদ্যমান, যা মানুষকে সহসা কোনো জিনিস চিন্তা করতে বা গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ আগে থেকে তার বদ্ধমূল কোনো ধারণা পরিবর্তন করতে সহজে প্রস্তুত হয় না। আসল ব্যাপার হলো, আমরা নিজেরা সর্বদাই নিজের মত এবং চিন্তাধারার পরিবর্তন করে থাকি। আমরা নিজেরাই নিজেদের ফয়সালাবিরোধী কাজ করে থাকি। অবশ্য এতে সময় লাগে। প্রথমে আমরা নিজেদের মত এবং বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং যে কোনো কিছুর বিনিময়ে হোক না কেন তাকেই ওপরে রাখার চেষ্টা করি, যদিও তা সম্পূর্ণ অমূলক ধারণা। মানুষের বদ্ধমূল ধারণা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে তার একটা গভীর সম্পর্ক এবং আন্তরিক ভালোবাসা মিশ্রিত থাকে। মানুষ কোনো বিশ্বাসের ব্যাপারে এটা খুব কমই চিন্তা করে যে, যুক্তি-প্রমাণের কষ্টি পাথরে আমার বিশ্বাসটা কি সুষ্ঠু এবং নির্ভূল? 'আমরা'- কথাটার গুরুত্ব নিশ্চয় বিরাট। এ অবস্থায় তাকে তার বিশ্বাসসমূহ থেকে ফেরানো মস্তবড় আয়াসসাধ্য ব্যাপার। বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে যে, আমরা শ্রোতার সামনে তার বিশ্বাসের দুর্বলতা ও অবাস্তবতার স্বরূপ যতোই উদঘাটন করি, সে ততোই তার সংরক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠে এসব ক্ষেত্রে এমন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত, যাতে সে নিজের পুরোনো বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পায় এবং নিজের থেকে সত্যোপলব্ধি করতে পারে। এটা এ ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা। কারো ধারণা যে, আমি শ্রোতার সম্মুখে যদি নিজের মত এবং এর গুরুত্ব প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তার ওপর আমার একটা প্রভাব পড়বে এবং তার কাছে আমার কথার ওজন বেড়ে যাবে। কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কেননা যখনই শ্রোতা মনে করবে যে, বক্তা তার মতের প্রাধান্যের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, তখন সে সম্পূর্ণ দূরে সরে যাবে এবং কিছুতেই তার কথা গ্রহণ করতে রাজি হবে না। কেননা এতে প্রত্যক্ষভাবে অন্যের মতকে হাল্কা প্রমাণিত করার প্রচেষ্টাই বাহ্যতঃ অধিক বলে মনে হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এটা ভালো করেই জানেন যে, নম্রভাবে কারো কাছে নিজের মত প্রকাশ করাটা কি পরিমাণ ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনায়াসেই নিজের মত পরিত্যাগ করে আপনার

মত গ্রহণ করে। অবশ্য প্রথমদিকে এ জন্যে প্রচেষ্টা ও অনুশীলন করতে হবে। তার পরেই এটা অভ্যাসে পরিণত হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, তাহলে কি কারো ভুল দেখা সত্ত্বেও কোনো অন্যায় কাজ হতে থাকলে বা ভুল কিছু হতে গেলে সে সময় এর সংশোধন প্রত্যেকের জন্যেই কর্তব্য হয়ে পড়ে। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, মুসলিম জাতির অস্তিত্বই ভূপৃষ্ঠ থেকে যাবতীয় ভ্রান্তনীতি, ভুল মত ও পথে চির অবসান ঘটাবার জন্যে। মুসলমানের জন্যে এটা ফরয যে, অবাঞ্ছিত কিছু হতে দেখলে সময় কালের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্ভব হদেল একে হাত দ্বারা যথা শক্তি বলে প্রতিরোধ করা আর না হয় মুখে বলে সে ভুল বা অপকর্ম সংশোধনের চেষ্টা করা। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, কোনো কিছু অন্যায় বা ভুল হতে দেখামাত্রই ঝট করে বলে দিতে হবে যে, এটা সম্পূর্ণ ভুল বা আপনি যা করছেন তা ভুল করছেন। তাছাড়া একটা বিষয়কে ভুল বলে উপলব্ধি করার পর প্রথমেই একে ভুল বলে আখ্যায়িত না করে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে না ক্ষেপিয়ে, কি এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা উত্তম নয়— যাতে সে ব্যক্তি নিজে নিজেই তার ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং এর পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সংশোধনে এগিয়ে আসে? আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে ভুল সংশোধনকালে উপরোক্ত ভূমিকা গ্রহণ করাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলে আমার বিশ্বাস।

যেমন ধরুন, আপনার শ্রোতা একজন অমুসলিম। পর্দা সম্পর্কে সে তার মতামত ব্যক্ত করছে। পর্দাকে সে নারী জাতির ওপর জুলুম মনে করে। স্বাস্থ্যের জন্যে সে পর্দা ব্যবস্থাকে মনে করে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সে ইসলামের এ বিধানটা নিয়ে হাসি-ঠাট্রা করে। আপনার নিকট পর্দা প্রথার প্রয়োজনীয়তা এবং এর সপক্ষে বহু মজবুত দলীল রয়েছে। আপনার জন্যে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তার এ উক্তিকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করা মোটেই অসুবিধার কথা নয়। কিন্তু যখন আপনি বুঝতে পারেন যে, শ্রোতা তার মতামতের ওপর আপনার যুক্তি প্রমাণাদির কোনো গুরুত্ব দিতেই প্রস্তুত নয়। সে ক্ষেত্রে আপনি নিজের দলীল প্রমাণাদি তার সামনে কিছুতেই উল্লেখ করবেন না। ঐ সময়ের জন্যে আলোচনা ওখানেই মুলতবী রেখে দেবেন। আপনি সহজভাবে তাকে বলবেন, আচ্ছা এখন এ বিষয়ে অধিক আলোচনা না করে অন্য সময়ের জন্যে এটাকে রেখে দিন। ঐ সময় এ সম্পর্কে আরো আলোচনা করা যাবে। এরূপ জটিল বিষয় সম্পর্কে এতো তাড়াহুড়ার ভেতর দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। এতে একে অপরের যুক্তি-প্রমাণাদি নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ হয় না। প্রত্যেককে অন্যের ন্যায়সঙ্গত যুক্তি

এবং মতবাদের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। এ জাতীয় কথাবার্তার প্রভাবে আপনি দেখতে পাবেন যে, শ্রোতা অত্যন্ত বিনয় হয়ে আসবে। আপনার কথাবার্তাকে সে আগ্রহ সহকারে বিবেচনা করবে। আপনি যদি এক সাক্ষাৎকারে 'পর্দার বিষয়' ছাড়া কোনো সমাজের নৈতিক অধঃপতনের আলোচনা করেন, তখন দেখতে পাবেন সে আপনার মতের প্রতিধ্বনি করছে। এখন আপনি তার নিকট বলবেন যে, নৈতিক অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা— আমাদের বিশ্বাস, তখন ঐ অবস্থায় কিছুতেই আপনার শ্রোতা আপনার কথার প্রতিবাদ করবে না। আলোচনার ভিতর দিয়ে মূল বক্তব্যের জন্যে তার মনে এতটুকু অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির পর এবার যদি আপনি তার কাছে গোছালোভাবে 'ইসলামী পর্দার' সঠিক রূপ কি তার পরিচয় দিতে পারেন, তাহলে আপনি দেখবেন, তার মনে এ যাবত পর্দা সম্পর্কে যে এক বীতশ্রদ্ধার ভাব প্রকট ছিল, তা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য গোঁড়ামীর ব্যাপারটা হলো স্বতন্ত্র। কিন্তু যথারীতি সুন্দরভাবে আপনি যদি আপনার কাজ করে যেতে পারেন, তাহলে দেখতে পাবেন, আপনার শ্রোতা পূর্বাবস্থা থেকে বহু অংশে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে।

এটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। এ ধরনের অসংখ্য সমস্যাবলী রয়েছে, যার সমাধান অত্যন্ত সহজ পন্থায় আপনি করতে পারেন। তবে এ জন্যে কার্যতঃ মানসিক দিক থেকে আপনাকে আগে থেকেই বহু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যে বিষয়ের ওপর আলোচনা হবে, সে সম্পর্কে শ্রোতার মনোভাব আপনাকে ভালোভাবে আঁচ করে নিতে হবে। এ কাজে সাধারণতঃ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হয় ঃ

১। ইসলাম ও দাসত্ব ২। একাধিক বিবাহ ৩। ইসলামী সমাজ মাত্র ৩০ বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল ৪। বর্তমান যুগে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? ৫। ইসলামের অর্থনীতি ৬। ধর্ম সর্বদা রাজনীতি মুক্ত থাকা চাই ইত্যাদি। এ সকল সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দানের জন্যে আপনার যথেষ্ট পড়াশুনা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা জরুরী।

যেসব ব্যাপারে মতের মিল রয়েছে

আদর্শের প্রচারক হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো মানুষের চিন্তাজগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং মানুষের চিন্তার মোড় এমনিভাবে ঘুরিয়ে দেয়া, যাতে সে অনায়াসেই আপনার যুক্তিকে মেনে নিতে পারে এবং উপলব্ধি করতে পারে আপনার আদর্শের স্বরূপ। সে যেন স্বেচ্ছায় পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় বহুদিনের মত ও পথ। তার মানে এ নয় যে, আলোচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণটাতেই আপনাদের উভয়ের মতের মিল রয়েছে, সে সকল বিষয়কে অবলম্বন করেই প্রথমতঃ আপনার আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে। কেননা ভবিষ্যত আলোচনা অর্থাৎ আসল বক্তব্যের জন্যে এটি আপনার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। সাধারণতঃ মানুষ প্রথমেই যে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে তা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে থাকে। এটা কিছুতেই ঠিক নয়। আপনি একটা নীতিগত কথার ওপর অবিচল থাকুন। প্রতিপক্ষকে কোনো অবস্থাতেই আপনার কোন কথার জবাবে 'না' বলার সুযোগই দেবেন না। আলোচনার শুরুতেই আপনাকে সতর্কতার সঙ্গে এমন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, যাতে সে প্রথম থেকেই আপনার কথায় "হ্যা" বলতে বাধ্য হয়। কেননা এটা স্বাভাবিক যে, কোনো আলোচনার শুরুতেই যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে "না" বলে ফেলে, তারপর এ অসম্মতিসূচক ভাবটিই শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। তার ব্যক্তিত্বের অহমিকা তাকে "না"-এর ওপরই বহাল রাখতে বাধ্য করে। তারপর "না" বলাটা অনুচিত হয়েছে— এটা উপলব্ধি করার পরও তার ব্যক্তিগত অহং তাকে এ থেকে নড়তে দেয় না। পরে তার মুখ দিয়ে "হ্যা" বের করাটা এক রকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাকে এ সুযোগ দেবেন না। কেননা সে একবার যা বলে ফেলে, তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই সূক্ষ্ম বিষয়টি স্মরণ রাখা দরকার যে, আলোচনা শুরু করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে শ্রোতা কিছুতেই একথা টের না পায় যে আপনি তাকে কোনো কিছু স্বীকার করানোর জন্যে বাধ্য করছেন। আপনার সঙ্গে তার যে যে বিষয়ে মতের মিল রয়েছে, সেগুলো একাধিকবার আলোচনা করবেন। চিন্তা করলে এরকম অসংখ্য দিক আপনি বের করতে পারবেন। এটাই আদর্শ প্রচারের সেই কৌশল যার দিকে নিম্নোক্ত আয়াতেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী

(সা)কে আল্লাহ্ তায়ালা আহলে কিতাবদের মধ্যে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে এভাবে প্রাথমিক আলোচনা করতে বলেছেন ঃ

"এসো এ ব্যাপারে আমরা আগে একমত হই, যে সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে।"

সত্যিই এটা কত সহজ পন্থা! কিন্তু সাধারণতঃ এদিকে অনেকে ভ্রুক্ষেপ করে না। বরং মনে করে যে, সর্বপ্রথমেই একটা যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ঝাড়বো, যাতে সে আমার যোগ্যতা এবং গুরুত্বকে স্বীকার করে নেয়। এবার এতে শ্রোতার মন বিদ্রোহীই হয়ে উঠুক না কেন এর কোনো পরোয়া করা হয় না। এটা সম্পূর্ণ ভুল রীতি। আপনি মানতে বাধ্য হবেন যে, কেউ যদি কেবল আনন্দ উপভোগের জন্যেই এমনটি করে থাকে তাহলে তা তো আলোচনার বহির্ভূত। কিন্তু যে ব্যক্তি এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় তার মতো অজ্ঞ আর দ্বিতীয়টি নেই। সক্রেটিস সম্পর্কে একটা প্রসিদ্ধ কথা আছে- তিনি যখনই কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের মতানুসারী করতে চাইতেন, তখন তাকে এমন সব প্রশ্ন করতেন যাতে সে প্রতিটি কথাতেই 'হাঁ' বলতে বাধ্য হত। তার আলোচনার কলাকৌশল এমন ছিল যে, শ্রোতাকে প্রতিটি কথাতেই তার সঙ্গে একাধারে 'হাঁ' বলে যেতে হতো। এমনকি তার আলোচনার মূল উদ্দেশ্য যা হতো তাও শ্রোতার মুখ দিয়েই স্বীকার করিয়ে নিতেন। এ পন্থায় শ্রোতার পক্ষেও বক্তার কথাগুলো মেনে নেয়া সহজ হয়। ঐ অবস্থায় শ্রোতা শেষ পর্যন্ত এমন কথাও স্বেচ্ছায় মেনে নিতে বাধ্য হয়, যা প্রথমে হয়তো কিছুতেই স্বীকার করতো না বরং বিশ্রীভাবে বলার দরুন সম্পূর্ণ অস্বীকারই করে বসতো, অথবা একবার 'না' বলে ফেললে তার ওপরই অটল থাকতো। কাজেই এ জন্যে যখনইআপনি কাউকে নিজের মতাবলম্বী করতে চেষ্টা করবেন, তখনই এ নীতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যাতে শ্রোতা কিছুতেই প্রথমেই 'না' বলার সুযোগ না পায়। বরং চেষ্টা করবেন যাতে সে শুরু থেকেই 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলে আপনার কথার স্বীকৃতি জানায়।

পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হোন

আপনার ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, একমাত্র ইসলামই মানব জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। আর আপনার এটাই কাম্য যে,

অপরাপর মানুষের চিন্তা জগতেও একমাত্র এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে উঠুক এবং মানুষের চিন্তা জগতে এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এক বিরাট রকমের পরিবর্তন ও বিপ্লব আসুক। বর্তমান বিশ্বের নৈতিকতাহীন অবস্থা দেখে আপনি অস্থির ও শংকিত। কেবল অস্থিরই নন, আপনি এর উচ্ছেদ সাধনেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর এ জন্যে আপনার নিকট মাল-মসলাও রয়েছে বিস্তর, যা আপনি আপনার পড়াশুনা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বর্তমান কলুষিত সমাজকে সংশোধনের জন্যে সঞ্চয় করেছেন।

এমতাবস্তায় এটাও একটা উপায় যে, আপনি আপানর শ্রোতাকে একই সময়ে এ জাতীয় সকল কথা শুনিয়ে দেবেন এবং আপনার সমর্থক করে ফেলবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে হয়তো আপনার অভিজ্ঞতা আছে যে, এতো সহজেই এ কাজ করে ফেলা কিছুতেই সম্ভব নয়। অপরের চিন্তার পরিবর্তন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতার ভূমিকা হবে আপনি আপনার আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতাকে এটা বুঝিয়ে দেবেন যে, আপনি তাকে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করেন। আপনার দৃষ্টিতে সে একজন চিন্তাশীল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। আপনি তার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। শ্রোতার মনে এ ধারণা সৃষ্টির পর আপনি দেখতে পাবেন, তার মন আপনার কথাগুলো কি পরিমাণ আগ্রহ সহকারে শুনতে প্রস্তুত হয়। এ জন্যে আপনাকে আপনার শ্রোতার সম্মুখে পূর্ব নির্ধারিত কতিপয় প্রশ্নাবলী স্থাপন করা উচিত। যেমন নৈতিকতা বিরোধী অবস্থার কিভাবে উচ্ছেদ করা যেতে পারে? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লুটতরাজের প্রতিকার কি? সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ কি করে কায়েম করা যেতে পারে? এবং এ সমাজের মাপকাঠি কি হবে? এ বিশ্ব মানুষের সত্যিকার স্থান কোথায়? ইত্যাদি। এসব জটিল প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করার জন্যে যখন আপনি শ্রোতকে আহ্বান জানাবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন— হয়তো এ ব্যাপারে তার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ খালি ছিল, এ নিয়ে সে হয়তো কোনোদিন চিন্তাই করেনি। এবং এখন সঙ্গে সঙ্গেই সে আপনার আন্দোলনকে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং যা বুঝেছে তার ভিত্তিতে বলতে শুরু করবে, "এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা এবং সুষ্ঠু কর্মপন্থার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।" এ ক্ষেত্রে শ্রোতাকে অক্ষম পেয়ে তখনি আপনার ইচ্ছা হবে তার সম্মুখে বিস্তারিতভাবে যুক্তি-প্রমাণ সহকার আপনার মতামত পেশ করতে। কিংবা তার অজ্ঞানতাপ্রসূত মন্তব্যের ওপর আলোচনা করতে এবং নিজের কথাকে আরো খুলে বলতে। এই দুই অবস্থার মধ্যে কোনো অবস্থাতেই আপনি শ্রোতাকে উপলব্ধি করতে দেবেন না যে, এ ব্যাপারে আপনার তুলনায় তার জ্ঞান অত্যন্ত

নগণ্য। অন্যথায় আপনাকে ব্যর্থ হতে হবে। আপনি তখনই সফলকাম হতে পারবেন যখন শ্রোতার কাছে আসল বক্তব্যটা ইশারা ইংগিত ও প্রস্তাবাকারে নিপুণতার সঙ্গে এমনভাবে পেশ করতে সক্ষম হবেন, যাতে তার অন্তকরণ আপনার প্রদত্ত যুক্তি প্রমাণাদিই গ্রহণ করছে বটে কিন্তু সে মনে করছে যে, আমি যা ভাবছি এবং চিন্তা করছি এটা একমাত্র আমারই অনুসন্ধিৎসাসুলভ চিন্তা-গবেষণার ফল। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি তাকে দেখেন যে, সে নির্ভুল পথ থেকে সরে যাচ্ছে, তখন তার অলক্ষ্যেই আপনি তাকে সঠিক পথে আনতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে, সে একেবারেই আপনার যুক্তি মানতে রাজি নয় বা আংশিকভাবে মানছে, তখন আপনাকে মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে লক্ষ্য করা উচিত। তখনই তার সামনে আপনি আপনার সকল যুক্তি-প্রমাণ উত্থাপনের চেষ্টা করবেন না, বরং সময়-সুযোগ মতো বাকি বিষয় অনায়াসেই আপনি তার থেকে স্বীকার করিয়ে নিতে সক্ষম হবেন। অবশ্য আরো একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, আপনার শ্রোতা আপনার সঙ্গে যতটুকু একমত হয়, ততটুকুর মধ্যেও আপনি তাকে একথা উপলব্ধি করাতে চেষ্টা করবেন যে, এ মতটাও তারই নিজস্ব। এ সম্বন্ধে সে যা বুঝেছে তা তারই চিন্তার ফল আর যতটুকু সে বুঝেছে, চমৎকারভাবেই বুঝেছে। এ পদ্ধতিতেই আপনার ভবিষ্যত পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যে প্রচারক তার শ্রোতা সম্পর্কে একথা উপলব্ধি করতে পারবে না যে, সে কেমন পরিবেশে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে সে পরিবেশের কি ধরনের প্রভাব রয়েছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার বা আলাপ আলোচনা করতে হবে, সে প্রচারক নিজের শ্রোতার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হতে বাধ্য। আলোচনাকালে শ্রোতার ওপর তার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব লক্ষ্যকারীই সার্থক প্রচারক। লক্ষ্য করার বিষয়, হয়তো আপনি গাভী পূজা করেন না, অজগর সাপকে দেবতা জ্ঞানে পবিত্র এবং পুণ্যময় মনে করেন না, মাজারে মাজারে গিয়ে মাজার প্রদক্ষিণ করেন না, পীরের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তাবিজ বাঁধাকে শিরক মনে করে থাকেন— এসব আপনার তেমন বিশেষ কিছু গুণাবলী নয়। হয়তো আপনি এ জাতীয় পরিবেশ থেকে কোনো রকমে চক্ষু বন্ধ করে নিজেকেই কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু সমাজে এমন কয়জন লোক আছে, যারা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা বলে এ সকল কুসংস্কার তেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম ? অধিকাংশ লোক এ জন্যেই এ সকল মূর্খতা এবং পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে যে, হয়তো সে যে

পরিবেশে লালিত পালিত সেখানে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। সুতরাং আপনার শ্রোতাও যদি এমন পরিবেশের কুসংস্কার দোষে দুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আপনি এ জন্যে তাকে অনেকটা অক্ষম মনে করতে পারেন। মানুষ অনেক সময় কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে প্রবেশ না করে ভাবাবেগেও অনেক কিছু করে ফেলে। এ জাতীয় মানুষের সংখ্যাই সমাজে অধিক বলে মনে হয়। এ পরিস্থিতিতে সত্যিকার জ্ঞান সরবরাহ করে মানুষের জ্ঞানচক্ষুর পাতা খুলে দিলে অনেকেই এ থেকে বিরত হবে। কেননা অনেক সময় পারিপার্শ্বিক প্রভাবে বা ভাবাবেগে মানুষ যা করে, সত্যিকার জ্ঞান দানের ফলে সুস্থ মুহূর্তে সে তা পরিহারও করে।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যারা আল্লাহ রাসূল এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে তারাও তো এ কথাই বলে থেকে যে, আমরা বহু অধ্যয়ন এবং চিন্তাগবেষণার পরই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এ ক্ষেত্রে অবশ্যি আংশিকভাবে তার কথা সত্য কিন্তু এমন লোকের সংখ্যাই বেশি যারা বস্তুতঃ কোনো কিছুই চিন্তা করে না। বরং হয়তো তারা যুগের হাওয়ায় ভাসছে নয়তো তাদের ওপর তেমন কোনো প্রভাব পড়ছে, যেখানে কোনো কিছু করার সময় চিন্তা ভাবনার পরোয়াই করা হয় না। সবাই একমাত্র হুজুগেই সবকিছু করে। এর ফলস্বরূপই ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে ধর্মবিরোধী ভাব প্রকট হয়ে ওঠে এবং ধর্ম সম্বন্ধে দানা বেঁধে ওঠে তাদের মনে যাবতীয় ভুল ধারণা। এ জাতীয় লোকদের প্রথমে নীতিবোধ পরিশুদ্ধ করাই হলো প্রাথমিক কর্তব্য। অবশ্য এটা অনেক শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

আরও একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আপনি কাউকে নির্বাক করতে পারেন, কিন্তু আপনার শ্রোতাকে অন্তর দিয়ে কোনো কিছু গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত করা অথবা তার মন থেকে পুরোনো ভাবধারাকে বের করে নতুনভাবে সত্যকে গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা নিছক বাকচাতুর্য বা যুক্তি-তর্কের দ্বারা সম্ভব নয় বরং এ জন্যে সুকৌশলে সাধারণ পন্থায় তার মধ্যে অনুপ্রেরণা এবং কর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করতে হবে। এ প্রেরণার মাধ্যমে আপনি যথেষ্ট কাজ আদায় করতে সক্ষম হবেন। কেননা এ প্রেরণা এবং প্রবণতাই তো মানুষকে অনেক অবাঞ্ছিত কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, যা যুক্তি প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে মানুষ ভ্রান্ত বলেই স্বীকার করে থাকে। আপনি সে ডাকাত সম্পর্কে কি বলবেন যে দিবারাত্র খুন খারাবি এবং জোর-জুলুম করে মানুষের অর্থ-সম্পদ লুট করে বেড়ায় আবার ওদিক দীন-হীনকেও সাহায্য দান করে, তাদের মধ্যে নিজের সব লুণ্ঠিত বস্তু বিলিয়ে দেয়? আসল কথা হলো, তার মধ্যে পাষণ্ডতার

সঙ্গে সঙ্গে পরোপকারিতার প্রবণতাও রয়েছে। সে চায়, মানুষ তাকে জনদরদী বলে মনে করুক। এই মানসিক সান্ত্বনা লাভ করার জন্যেই সে এমনটি করতে পুলক অনুভব করে। অথচ ন্যায় এবং সত্যের মাপকাঠিতে সেও তার পেশাকে গর্হিত বলে মনে করে। এ দৃষ্টান্তকে সম্মুখে রাখলে এ সত্যটিই আমাদের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে যে, মানুষকে কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হলে অনেক সময় দলিল-প্রমাণ এবং বাকচাতুর্য অপেক্ষা তার ভাব-প্রবণতাই অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে।

সুতরাং আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো সময় মানুষের উন্নত সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আবেদনের সাথে সাথে তার বিভিন্ন ভাবাবেগের প্রতিও আবদেন জানাবার চেষ্টা করা উচিত। যেমন মানুষের মানসিকতা, সততা, উন্নত রুচিবোধ, জনসেবা, সমবেদনা, চরিত্র, উল্লেখযোগ্য কীর্তি, অবদান ইত্যাদি। ■

"ডাক তোমার প্রভুর পথে
হিকমত ও উত্তম নসিহতের
সাহায্যে
আর লোকদের
সাথে বিতর্ক কর
উত্তম পন্থায়"।

www.icsbook.info